মূর্ছনা
==============================
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
==============================
suman_ahm@yahoo.com

অল লেডিজ ভ্রমণ

বাণী বসু

(১)

বেড়াতে যাওয়ার নামে আমি একপায়ে খাড়া। নিরুপম অর্থাৎ আমার রাজনৈতিক স্বামী আর শান্তশীল, আমার ক্রীড়ানৈতিক ছেলেকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে বুঝিয়ে-বাজিয়ে নিতে আমার খুব বেশি সময় লাগে না। শেফালী আছে, বললুম শান্তকে দেখবি কিন্তু। কোনও গন্ডগোল হলে তোর কী হয় একবার দেখিস। তা তিনি বললেন -- কী আবার হবে বৌদি। যাওয়ার আগে একখানা, এসে আরেকখানা কাপড় দিও, তা'লেই হবে। শান্ত সোনার কোনও কষ্ট হবে না। কী ধরনের ধুরন্ধর মার্সিনারি আজকালকার লোকজন হয়েছে বুঝুন। কাপড় দিলে কষ্ট হবে না, এর উল্টো পিঠে কী ? কাপড় না

দিলে কষ্ট হবে, এই তো ? ছি ছি। ধিক্কারে মন ভরে যায়। কটমট করে তাকাই। কোনও ফল হয় না কেন না তিনি তখন ঘরের একদিকে আলনা গুছোচ্ছেন বা ঘুছোবার ভান করছেন। হঠাৎ পেছন ফিরে বললেন এই কাপড়টার কথা বলছিলুম বউদি। দেখি আমার তুঁতে রঙের শাদা বুটি তোলা টাঙাইলখানা তুলে দিয়েছেন, গতবার শিল্পী আমার ছোট বোনের মতো বন্ধু আমায় উপহার দিয়েছিল।

গম্ভীরভাবে বলি -- শাড়িটা রাখো। আর সাবধান করে দিচ্ছি শান্ত আর সোনা নেই, লোহা হয়ে গেছে। তার সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে যেও না। সে তোমার মাথা টিপ করে বোলিং প্র্যাকটিস করতে পারে। একটি জিনিস ভাঙবে না, চুরবে না। কাচের বাসন আমি তুলে যাচ্ছি।

আমার এই শ্রীমতীটি এনতার বাসন ভাঙেন। মুড়মুড় করে ভেঙে ফেলেন। প্রতিদিন -- ওইয্ যা বউদি পেলেটটা গেল।

-- কোন প্লেট ? আমি আকুল হয়ে ছুটে যাই।

-- ফুল তোলাটা।

-- ওটা যে আমার সেটের !

কী শাস্তি দেবে দাও বউদি, আমি রেডি। নিজের দু কান ধরে এতখানি জিভ বার করে মা কালী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন শ্রীমতী শেফালী। অর্থাৎ নিজেই নিজেকে শাস্তি দিচ্ছেন।

আমি বলি -- তোমার হচ্ছে।

কিন্তু মালতী জানে কিছুই হবে না। কিচ্ছু করার মুরোদই আমার নেই।

আমার প্রাণের বন্ধু কাজলকে ফোন করি -- ধরে তার মেয়ে তীর্ণা -- রঞ্জু মাসি। খুব ভাল হয়েছে। তুমি ফোন করেছ, আমিই আর একটু হলে তোমাকে ফোন করতুম।

-- কেন ? কী হল ?

-- মা ক্ষেপে গেছে।

-- মানে ?

-- বলছে তীর্থে যাবে -- গয়াগঙ্গাপ্রভাসাদি -- একেবারে অ্যাডামেন্ট।

আমি সঙ্গে সঙ্গে কাজলের স্ট্র্যাটেজিটা বুঝে যাই। তালে তাল দিয়ে বলি --

কেন ? তীর্থে যাওয়ার রাইট তোমার মায়ের নেই ? খালি তোমাদেরই আছে ?

-- বারে, আমরা আবার তীর্থে গেলুম কোথায় ?

-- কেন ? এই যে সেদিন অমরনাথ গেলে।

-- সে তো ট্রেকিং করতে।

-- সেই যে কেঁদুলি গেলে ?

-- সে তো মেলা দেখতে।

-- কামাখ্যাও গেলি না ?

-- আসাম টুর করছিলুম, কামাখ্যাটা ইন্টারেস্টিং জায়গা -- দেখবো না ?

-- বেশ। আমরাও সেইরকমই ইন্টারেস্টিং জায়গা দেখতে যাচ্ছি। যাব।

-- তুমিও যাচ্ছ নাকি ?

-- তা কাজলা যাবে আর আমি বাড়ি বসে কলম চুষবো ?

-- তুমি গেলে ঠিক আছে -- খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজলের মেয়ে তীর্ণা বলল -- ইন দ্যাট কেস ইট ইজ নট তীর্থ-টির্থ। তুমি যা নাস্তিক ! গোপালের চেয়েও। মায়ের তাহলে সংসারবৈরাগ্য হয়নি।

-- কেন ? বৈরাগ্যের কোনও কারণ ঘটেছিল নাকি ?

তীর্ণা ফোনের মধ্যেই ফিকফিক করে হাসতে লাগল।

-- কী হচ্ছে ? ব্যাপারটা কী বল্ -- আমার যে বিল উঠছে।

-- মা তো এনতার চুরি করে, ধরা পড়ে গেছে।

-- মাকে চোর বলছিস ?

-- চোর বলিনি তো। বলেছি চুরি করে, দুটোর মধ্যে একটা সাটল ডিফারেন্স আছে রঞ্জু মাসি, তোমার বোঝা উচিত। আলমারিতে মায়ের শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে নোট। একশ টাকার পাঁচশ টাকার, দশ-কুড়ি টাকার। এমন কি পাঁচ টাকারও, মানে যা যখন হাতাতে পেরেছে হাতিয়ে নিয়েছে আর কি।

-- বেশ করেছে -- আমি আমার বন্ধুর পক্ষে থাকি।

-- বেশ করেনি -- বলিনি তো ! মা চুরি না করলে আমার দরকার হলে কে টাকা দেবে বল। দাদাটারও তো প্রায় একই অবস্থা। এই দ্যাখো রোজগার করছে, কড়কড়ে নোটা ভাঙালো, আবার এই দ্যাখো, মাথার পেছনে হাত দিয়ে কড়িকাঠের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে শুয়ে রয়েছে। কী ? না চাকরি আর নেই।

-- তাহলে এত কথা কেন ?

-- চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড় ধরা -- রঞ্জু মাসি। মা যে বাবার কাছে ধরা পড়ে গেছে।

-- কী করে ? তোর বাবা কি আজকাল শাড়ি পড়া ধরছেন নাকি ?

-- তীর্ণার হাসি আর থানে না। উঃ তুমি পারোও রঞ্জুমাসি। ঢাকাই শাড়ি পরা ভুঁড়িয়াল গঙ্গাপ্রসাদ। উঃ।

আমি বলি -- লজ্জা করে না ? বাবাকে গঙ্গাপ্রসাদ বলছিস ?

-- কী আশ্চর্য। তীর্ণা বলে, গঙ্গাপ্রসাদকে গঙ্গাপ্রসাদ বলব না তো কি যমুনাপ্রসাদ বলব ? এবার বোধহয় বলবে ভুঁড়িয়াল বললি কেন ? তার উত্তরও তোমাকে আগাম দিয়ে রাখছি। ভুঁড়িয়াল বলেছি এই যথেষ্ট, ছিটিয়ালটাও বলা উচিত ছিল ...

আমি কাশি সামলে বলি -- কাজলাকে দে।

কিছুক্ষণ পর খুব গম্ভীর গলায় কাজল বলল -- বলো !

মুড একেবারে অফ্‌ফ -- বোঝাই যাচ্ছে।

যেন কিছুই জানি না এমনই করে বলি -- সুমিতার তো টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছে। তবে স্লিপারে কিন্তু। নো এসি।

-- আমি যাচ্ছি না। তবু জিজ্ঞেস করি স্লিপারে কেন ? লেখিকা দৃশ্য দেখবেন বলে ?

-- এগজ্যাক্টলি। শীতকাল তো। কষ্ট কিসের ? তুই যাচ্ছিস না মানে ?

-- আমি অপমানিত হয়েছি।

-- সে কী রে ? কে তোকে অকমান করল ? গোপলা ? -- গোপাল তীর্ণাদের এক বন্ধু। কাজলা তাকে দেখতে পারে না।

-- রঞ্জু মুখ সামলে, গোপলা কি ন্যাপলার সাধ্য নেই আমাকে অপমান করে। আর দয়া করে অন্তত আমার সামনে ওই গোপালীয় ভাষা অকমান-টকমান ব্যবহার করবে না। জানি তোমার এই জেনারেশনের সঙ্গে খুব মাখামাখি ...

আমি বলে উঠি, বেশ, বলব না। তা তোর অপমানটা করলে কে ? কার এত বড় সাহস ?

-- আমার ভুণ্ডিল মুনি, আবার কে ?

আপনাদের বলে রাখি কাজলরেখা তার অধ্যাপক স্বামী গঙ্গাপ্রসাদকে ভুণ্ডিল মুনি বলে উল্লেখ করে থাকে। এতে গঙ্গাপ্রসাদের চেহারার ওপর বিলক্ষণ কটাক্ষ আছে। যাঁরা পরশুরামের 'প্রেম চক্র' গল্পটি পড়েছেন তাঁরা সবাই বুঝবেন।

-- ডিটেল বল, কিসের অপমান, কেন অপমান ?

-- রঞ্জু তুই অলরেডি তীর্ণার সঙ্গে একগঙ্গা কথা বলেছিস। ন্যাকা সাজিসনি।

-- আহা না না, ডিটেল ডিটেল। সংসার বৈরাগ্য শুনলুম, এখন অপমানিত শুনলুম, বাকিটুকু বল।

আমি জানি বলবার জন্যে কাজলার পেট ফুলছে।

ফোনে ঝাঁঝিয়ে উঠল -- ভাবতে পারিস একটা ব্যাটা ছেলে মেয়েদের আলমারিতে হাত দেয় ?

-- না পারি না, কিন্তু দিলেন কেন ? কী খুঁজতে ?

-- কিচ্ছু খুঁজতে না, আমায় ফ্যাসাদে ফেলতে। মুখে বলছে আমি আলমারি গুলিয়ে ফেলেছি। ধুতি ভেবে শাড়িতে হাত দিয়েছি। এটা বিশ্বাসযোগ্য ?

-- ভোলেভালা তো। হতেই পারে। তো তারপর ? অঝোরধারে নোট বৃষ্টি ?

-- রঞ্জু তুই আমার বিপদে হাসছিস ?

-- কোথায় হাসলুম ?

-- হাসো আর নাই হাসো কাজলরেখা মিত্তির সাফ কথা বলে দিতে ভয় পায় না। বলে দিয়েছি -- দিস ইজ হোম ব্যাঙ্ক। যার বাড়িতে দুটো দামড়া ছেলেমেয়ে 'আজ চাকরি কাল নেই' হয়ে আছে, যে ফ্যামিলিতে কর্তা আকচার একশ টাকার নোট ভেবে পাঁচশ টাকার নোট দিয়ে ফ্যালেন, সে বাড়িতে শাড়ির ভাঁজে ব্যাঙ্ক থাকবে, থাকবে, থাকবে।

-- বেশ বলেছিস। ঠিক বলেছিস।

একটা ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল কাজল, বলল, তুই কী বুঝবি রঞ্জু। নিজে রোজগার করিস, তোকে তো এসব ফেস করতে হয় না।

আমি বলি -- তা সে যাই হোক, তুই তো নিজের মান রক্ষা করেছিস। আবার অভিমান কিসের ? যাব না বলছিস কেন ?

-- কী করে যাব। হোম ব্যাঙ্ক মানে হোমের অন্য লোকেদের জন্যে আমি জমাচ্ছি। ধর এমন অবস্থা যে হাঁড়ি চড়ছে না। আমি ঝনাৎ করে টাকা ফেলে দিলুম, কোনওদিন অন্নপ্রশনের নেমন্তন্ন, উপহার নিয়ে মাথায় হাত। আমি ঝনাৎ করে টাকা ফেলে দিলুম। সে আলাদা কথা।

-- কেন রে কাজলা, প্রভাদি একটা দারুণ ঢাকাই টাঙাইল এনেছে ঝনাৎ করে টাকা ফেলে দিলি এমন হয় না ?

জবাব দিতে কাজলার এক পলকও সময় লাগল না, বলল -- সে আমাকে জন্মের ভাত-কাপড় দেবে কড়ার করে এনেছে না ? শাড়ি আমার হক, চিকেন রোল আমার হক।

আমিও দেরি করি না, বলি -- গয়াগঙ্গাপ্রভাসাদিও তোর হক।

কিছুক্ষণ চুপ। তারপর ওপাশ থেকে ক্ষীণ গলায় ভেসে এল -- বলছিস !

-- নিশ্চয়ই !

-- তবু !

আমি বলি -- তোর হোম ব্যাঙ্ক থেকে হয় তো হয়ে যাবে, তবু তুই তোর ভাতকাপড় দেনেওয়ালার কাছ থেকে ট্রাভলিং অ্যালাউন্স কড়ায় গন্ডায় বুঝে নিবি। আর আলমারির চাবি সাবধান। তোর গেঁড়াগেঁড়ি দুটো সিন্দুকের সন্ধান পেয়ে গেছে।

কাজলা বলল, সিন্দবাদরা সিন্দুকের সন্ধান পাবেই, আটকাতে পারবি না। তাছাড়া সব-খোল চাবিটাবিও কি আর ওদের পকেটে নেই ? তবে ঘাবড়াস না আমি ব্যাঙ্ক সরিয়ে ফেলেছি। কাজলরেখা মিত্তিরকে টেক্কা দেওয়া অত সহজ নয়। কী রে ? তাহলে বাকসো গোছাই ?

কাজলার মুড পাল্টে গেছে। আমিও উৎসাহিত গলায় বলি -- সিনথিটিক আর সিল্ক নিবি, ভেতরের ড্রয়ার, ভেস্ট নিলে, ওপরের গরম জামা কম লাগবে -- মনে রাখিস। তা ছাড়া দার্জিলিঙের মলে তো যাবি না -- একগাদা নিবি না, দামি জিনিস নিবি না। ঠিক আছে ?

কাজলা বলল -- ফাঁকতালে জ্ঞান দিয়ে নিলি ? পারিসও রঞ্জু ! তাহলে যাচ্ছি ? --

-- অবশ্যই। -- এইভাবে কাজলার সংশয় দূর করা গেল।

(২)

বাকসো গোছাচ্ছি মনের আনন্দে। শিল্পীর ফোন এল। দেখি তিনি আবার কী বলেন ?

-- রঞ্জুদি স্যরি। আমি যাচ্ছি না।

আমি বলি -- ঠিক আছে।

-- মানে ? শিল্পী চেঁচিয়ে ওঠে -- একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলে না, কেন ?

-- নিশ্চয়ই সঙ্গত কারণ আছে -- আমি খুব গম্ভীরভাবে বলি। আমারও গাম্ভীর্যেরও যথেষ্ট কারণ আছে। এই শিল্পী বরাটই আমাদের অল-লেডিজ ভ্রমণের আইডিয়াটি মাথা থেকে বার করেছিলেন। জায়গা নিয়ে আমাদের ঝাড়াই-বাছাই পর্বেও এঁরই ছিল

প্রধান অংশ। এখন যদি ইনি বলতে পারেন স্যরি আমি যাচ্চি না, আমিও নিরাবেগ কন্ঠে বলতেই পারি -- ঠিক আছে। কী ? পারি না ?

শিল্পী বরাটের পতি কর্পোরেট হাউজে ভাল চাকরি করেন, মালকড়ি ভাল পান, তার ওপরে যখন তখন সিঙ্গাপুর, হংকং, ম্যানিলা ... তিনিই প্রস্তাব দ্যান -- দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া/ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া/ একটি ধানের শিষের উপর একটি শিশির বিন্দু।

সুতরাং কাশ্মীর না, কুলু-মানালি না, অরুণাচল প্রদেশ না, কেরালা না -- আমরা যাব রাজগীর। কারণটা কী বলুন তো ? আসলে উনি কাশ্মীর, কুলু-মানালি, অরুণাচল, কেরালা সবই ঘুরে ফেলেছেন। হাতের কাছের রাজগীরটা বাকি ছিল। এই আর কি ! এখন টিকিট কাটা হয়ে গেছে, বাকসো গুছনো শুরু হয়ে গেছে, সেই শিল্পীই বলছেন স্যরি, আমি যাচ্ছি না।

তো ঠিক আছে।

-- শোন, রঞ্জুদি রাগ কোর না, সুমিতাদি থ্রি টিয়ার স্লিপারের টিকিট কেটেছে তা জানো ?

-- জানি।

-- গয়া প্যাসেঞ্জার, তা জানো ?

-- জানি। আমরা বোধগয়া হয়ে যাব তো ঠিক ছিল।

-- এসি কাটা যেত না ?

-- যেত, কিন্তু আমাদের প্রেফারেন্স ছিল নন-এসি। শীতকাল। গরমের প্রশ্ন নেই। এসি-তে আটকাঠ বন্ধ করে বসে থাকতে ভাল লাগে না। গয়া প্যাসেঞ্জারে বোধহয় এসি নেইও।

-- চন্দন বলছে আর কোনও ট্রেন ছিল না ? গয়া প্যাসেঞ্জারের পাবলিক জানো ?

-- হ্যাঁ-অ্যাঁ। সব পিন্ড দিতে যাচ্ছে গয়ায়, জানবো না কেন ?

-- আজ্ঞে না, তার সঙ্গে আরও আছে। ওরা ইউরিন্যালের সঙ্গে বেসিনের তফাৎ জানে না।

ঠিক কথাই বলেছে শিল্পী। জাপানে নাকি কে এক ভারতীয় ট্রেনে উঠেছেন জানতে পেরে কর্তৃপক্ষ সব টয়লেটে তালা মেরে দিয়েছিলেন। স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকাকালীন যে এই কর্মগুলি করতে নেই ভারতীয়দের আজও শেখানো যায়নি।

-- কী চুপ করে আছ যে ! জবাব দাও। কী ভয়াবহ ব্যাপার তা তোমার ধারণা আছে ?

-- আছে। ব্যবস্থা হবে। সুমিতা বলে দিয়েছে।

-- স্লিপারে সকালে বসবার সিট ছেড়ে দিতে হয়। সকালে পাশে সব কারা এসে বসবে, ঠেসবে জানো ?

-- জানি, গন্ধগোকুল।

-- জানো তো সবই দেখছি। সাধ করে হাড়কাঠে গলা রাখতে যাচ্ছ কেন ?

-- শিল্পী, কালকূট মানে সমরেশ বসু যখন কুম্ভমেলায় গিয়েছিলেন, কীভাবে গিয়েছিলেন ? তবে না অমৃত-টমৃত বেরোয়।

-- অ। তুমি অ্যাট আওয়ার কস্ট্ তোমার লেখার মেটিরিয়াল সংগ্রহ করতে যাচ্ছো ?

আমি বলি -- নো। অ্যাট মাই কস্ট্ ও কষ্ট, পুরো ভাড়া দিয়েছি ভাই, কষ্ট যা হবে তা শুধু তোমরা পাবে না, আমিও পাব। কথা দিচ্ছি গন্ধগোকুল থাকলে তার পাশে আমিই বসব। অ্যান্ড য়ু আর ফ্রি টু কুইট।

কিছুক্ষণ চুপ। তারপর যেন একটা ফোঁপানির মতো আওয়াজ পেলুম।

-- কী হল ? কাঁদছিস নাকি ? বলি।

শিল্পী ঝাঁঝিয়ে ওঠে -- কাঁদতে আমার বয়ে গেছে। আমার বন্ধুদের চরিত্র স্টাডি করছি। কত সহজে বলে দিলে ফ্রি টু কুইট। যাবি না -- ঠিক আছে। বা বা বা। আমার একটা পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে না। আমি কিছু সাজেস্ট করতে পারি না। কোনও রাইট নেই ... বলেই যাচ্ছে, বলেই যাচ্ছে।

তখন আমি বলি -- শিল্পী মনে কর না তুই মিসেস বরাট, মাল্টিন্যাশনালের সিনিয়র ম্যানেজারের বউ নয়। একজন বালিকা, প্রথম বন্ধুদের সঙ্গে একসঙ্গে এক্সকার্শনে বেরিয়েছিস। দারুণ একসাইটমেন্ট। কোনও অভিভাবক নেই। শুদ্ধু পাঁচ বন্ধু। অন্যরা আবার তোর থেকে বড়, কেউ কেউ যেমন সুমিতা সরকার ও মালবিকাদি রীতিমতো এক্সপার্ট, অভিজ্ঞ লোক। ঘাবড়াচ্ছিস কেন ?

-- তা না হয় ঘাবড়ালুম না। না হয় তোমরা সব ঠিক করে দিলে। কিন্তু আমার বরাট ? সে যে নাক সিঁটকে ছিছিছিছি করছে !

-- স্নব বরদের কথা ছেড়ে দে। ওদের সঙ্গে ভিড়ে থাকলে জীবনের কিছুই দেখতে পাবি না। মজাও জিরো।

-- কী করে মানাব ?

-- সে সব কৌশল তোকে বলে দিতে হবে ? শিল্পী তুই একটা কলাকার লোক, নাঃ সত্যি। হাসালি।

শিল্পী হি হি করে হেসে বলল আমি কিন্তু জিনস পরে যাব, ঘুরবো।ট্রাভলিং-এ শাড়ি পরতে আমার খুব অসুবিধা হয়।

-- নিশ্চয়ই পরবি। যত জিনস পরবি তত আমাদের সুবিধা হবে। কড়া করে লিপস্টিক দিবি। সিগারেটের একটা প্যাকেট রাখবি। ফাইন।

-- হ্যাঁ, আমি স্মার্ট ইয়াংকি হয়ে যাই আর তোমরা ন্যাতাজোবড়া হয়ে, সোয়েডের টিপ, কাজলদির শাঁখা-পলা, ইয়া খোঁপা। কোনও এফেক্টই হবে না।

আমি বলি -- দ্যাখই না কী হয়। তোর স্মার্টনেস তোর। আমার স্মার্টনেস আমার। স্মার্টনেসেরও রকমফের আছে খুকুমণি।

-- তুমিও কি পেন্টুল পরতে ভাবছো না কি রঞ্জুদি -ই-ই !

চিৎকার ছাড়ল একটা শিল্পী।

-- কেন ? পরলেই বা !

-- প্লিজ রঞ্জুদি, তোমার জিনস-এর ফিগার নয়, প্লিজ রঞ্জুদি-ই, সে ক্ষেত্রে আমি যাব না। -- আমি স্বভাবতই খুবই মনে করি, বলি -- আমার ফিগার যদি তোমার ভ্রমণানন্দের পথে কাঁটা হয়ে থাকে, তাহলে চুলোয় যাক ভ্রমণ। আমিই যাব না। যাচ্ছি না, মাফ করতে হল।

প্লিজ রঞ্জুদি ফোনটা রেখো না। আমি তা মীন করিনি। তোমার ফিগার খুব সুন্দর। আমার বর পর্যন্ত বলে। খুব ঢেউ খেলানো। ফিগারের কোনও কসুর নেই। জিনসটা ঠিক, মানে কখনও তো দেখিনি ... ঠিক আছে পরো। আমি কিচ্ছু বলব না। হাসবো না। একেবারে স্পিকটি নট।

-- আমি যাচ্ছি না -- আমি আবার বলি -- সুমিতাকে তুমিই জানিয়ে দাও কথাটা।

-- সুমিতাদি আমাকে মেরে পুঁতে ফেলবে রঞ্জুদি। তুমি আর কাজলাদি না গেলে জমবে কী করে ? তা ছড়া তোমার অমন মূল্যবান কেরিয়ারটার কথা আমরা ভাবব না। বন্ধু লোক !

আমি বলি -- বোকা বন্ধু চালাক শত্রুর চেয়ে বিপজ্জনক।

একটু চুপ করে রইল শিল্পী। তারপর বলল, ঠিক আছে, হজম করলুম। আমি বোকা, আমি স্নব। সব মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তুমি প্রসন্ন হও। প্রসীদ প্রসীদ দেবী। এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি ওঁ শ্রী রঞ্জনাদেব্যৈ নমো নমঃ। সংস্কৃতটা ঠিক না হলে কিছু মনে কোর না রঞ্জুদি। বোকা, স্নব, মূর্খ আমি সব। কিন্তু তুমি চলো।

আমি এবার গম্ভীরভাবে বলি -- তার মানে তুমি নিঃশর্তে যাচ্ছ ? ইনস্পাইট অব নন-এসি, ইনস্পাইট অব গয়া প্যাসেঞ্জার, ইনস্পাইট অব গন্ধগোকুল এবং নো ডিফারেন্স বিটুইন বেসিন অ্যান্ড ইউরিন্যাল, ওকে ?

-- ওঃ, ওঃ, ওঃ, শিল্পী চেঁচাতে লাগল। তারপর বলল, হ্যাঁ ইন্সপাইট অব এভরিথিং প্লাস রঞ্জুদিজ জিনস শিল্পী বরাট যাচ্ছে। শিল্পী বরাট কিচ্ছুকে ভয় পায় না।

আমি বলি -- গুড। দ্যাটস দা স্পিরিট।

-- এবার একটু হাসো রঞ্জুদি।

-- হাসছি। হাঃ হাঃ। ঠিক আছে ?

-- একদম ওক্কে। চন্দন বরাট আসুক না একবার, স্নবটাকে দেখাচ্ছি মজা ? একেবারে যার-পর-নাই।

সুমিতাকে ফোন করে সব জানাই। শাড়ির ভাঁজে নোট থেকে জিনস পর্যন্ত।

সুমিতা বলে -- আমি আগেই জানতুম। সাইকোলজির লোক তো।

শিল্পীর যেমন মুখের লবজ 'যার-পর-নাই', সুমিতার তেমনই 'সাইকোলজির লোক তো !'

-- জানতিস যদি তো এমন ব্যবস্থা করলি কেন ?

সুমিতা বলল -- তুমিও সেটা বুঝতে পারছ না, একজন লেখিকা হয়ে ?

না -- আমি সোজা জবাব দিই।

-- বলিস কি রঞ্জুদি ! আরে ফ্রম এসি টু এসি ফ্রম ওয়ান ফাইভ স্টার হোটেল টু অ্যানাদার ফাইভ স্টার হোটেলে ঘুরলে পৃথিবী দেখা যায় ? জীবন দেখা যায় ?

-- কেন আনজুনার সী বিচ, ইলোরার কৈলাস মন্দির, মহাবলীপুরমের জায়ান্ট মহাবীর ঐতিহাসিক বল প্রকৃতিকই বল -- এসব তো হোটেলের বাইরেই থাকে।

-- ওহ, সামান্য কথাটা বুঝছো না কেন ? সুমিতার ধৈর্য থাকে না -- লিভিং লিভিং পীপল পীপল। জানো আমাদের জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টকে প্রতি বছর দুটো করে এক্সকার্শন করতে হয়। একটা অনার্সের আরেকটা পাসের। তো আমি বেশিরভাগগুলোতেই সহযোগী অধ্যাপিকা হিসেবে যাই।

-- এবং জীবন দেখিস, মানুষ দেখিস।

-- একজ্যাক্টলি। তার সঙ্গে আরও অনেক জ্ঞান লাভও লাইভ অডিও-ভিসুয়ালের মাধ্যমে হয়ে যায়।

-- বেশ ভাই। আমাদের তুমি জীবন ... মানুষ ... পৃথিবী দেখিও। শেষ কালটায় আবার যেন শিল্পী প্রমুখের কোনও আক্ষেপ না থেকে যায়।

-- প্রমুখটা কে ?

-- কেন মালবিকা সান্যাল।

আসলে মালবিকাদির বিকাশকান্তি আর শিল্পীর চন্দন বরাট এরা দুজনেই বড় চাকুরে। প্রথমজন সরকারি, দ্বিতীয়জন বেসরকারি। দুজনেরই ব্যাগ-ভর্তি মালকড়ি। মনমেজাজ ভর্তি 'বড়মানুষি' -- থাকার কথা, আছে বলছি না। সেভাবে থাকলে আর আমাদের গলাগলি ভাবই বা হবে কী করে ! শিল্পী আর কাজল ছাড়া আমরা বাকি কজনও স্বাধীন নারী। স্বামীর পকেট-নির্ভর নয়। মালবিকাদি তার মহিলা সমিতি মারফৎ মহিলা কল্যাণ তো করেই, ফাঁকতালে কামায়ও বেশ -- দিলদরিয়া মেজাজ দেখেই সেটা বোঝা যায়। সুমিতার বর জাহাজে কাজ করে, সে তো মেলা টাকা পায়, পাঠায়। সুমিতার কলেজের মাইনেটা পুরো উদ্বৃত্ত, সুমিতা একেবারেই স্বাধীন ললনা। আমি লিখি, বিধুভূষণবাবু আমার প্রকাশক, যথেষ্ট ফাঁকি দিয়েও আমাকে নিয়মিত 'পে' করেন, আমি ওঁর ফাঁকি মাফ করে দিই। কিন্তু কাজলা আর শিল্পীকে আমরা কিছুতেই দলে টানতে পারিনি। কাজলা বলে, রান্না-বান্না মানে কুটনো কোটা, বাটনা

বাটা, সেদ্ধ করা, অসেদ্ধ করা, কাপড় কাচা, জল তোলা, বাসন মাজা, ইস্ত্রি করা, ধুমসো তিনটে লোককে উঠতে বসতে সেবা করা -- এরপরও তোরা আমায় কাজ করতে বলিস ? ধিক তোদের।

-- সেদ্ধটা বুঝলুম কিন্তু অসেদ্ধটা কী জিনিস -- মালবিকাদি জিজ্ঞেস করে।

-- কেন ? স্যালাড করা ? স্যালাডটা অসেদ্ধ নয় ?

শিল্পী হাততালি দেয় -- ঠিক বলেছো কাজলদি, এ পয়েন্টটা আমার মনে আসেনি। চীয়ার্স।

-- গৃহবধূদের সম্মান করতে শেখ তোরা রোজগেরেরা -- কাজল সঙ্গী পেয়ে দ্বিগুণ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে।

-- মেয়েরাই যদি গৃহবধূর কাজের মূল্যায়ন করতে না পারে, তাহলে প্রসাদবংশ কী করে পারবে ? সে বলে।

আমি খুব সন্দেহ সন্দেহ গলায় বলি -- তোর কাপড় কাচা, বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার করার লোক নেই ?

-- না থাকারই মতো। কবে সে আসবে, কবে সে আসবে না, সে তো বলে রাখে না। আর এলেও তার কাচা কাপড় আমায় হরবখত আবার কাচতে হচ্ছে, তার মাজা বাসন আবার মেজে নিতে হচ্ছে -- তাছাড়া সুপারভাইজ সেটা বুঝি কম কিছু ? ছোটতে ছেলেমেয়েকে রীতি মতো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার পড়িয়েছি। ঝি কাম রাঁধুনি কাম টিউটর, কাম ওভারসিয়ার। মোট কত পাওয়ান হয় তোরাই হিসেব কর না। ভুন্ডিলের পকেটে কুলোবে না তাই একটা বিয়ে করে ফেলেছে।

আর শিল্পী ? তাকে উপার্জনের কথা বললেই বলবে -- মাস গেলে আমার বর আমায় আদর করে ছ হাজার টাকা হাত-খরচ দেয় ভাই। পার্লার, জামাকাপড়, গিফট এসব আলাদা, একদম আলাদা। আমার কোনো আত্মগ্লানি হয় না, প্রথম কারণ দেওয়াটা

ভালবাসার দেওয়া, দ্বিতীয় কারণ -- একটা হোটেলের চিফ শেফের মাইনে আরও অনেক, অনে-ক বেশি।

-- তোকে কট্টুকু রাঁধতে হয়। তাও তো লোক আছে।

-- লোক আছে, কিন্তু রান্নাটা আমিই করি। হোটেল স্ট্যান্ডার্ড। মেনু শুনলে তোদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে। হোম সায়েন্স তো দু-বছর পড়েছিই। তার ওপর সব রকম রান্নার তালিম নিয়েছি -- মোগলাই, চাইনিজ, থাই, কন্টিনেন্টাল, টিবেটান, ফরাসি ... আমার শ্বশুর-শাশুড়ি-বর-মেয়ে দু-দিন একরকম খায় না। আমি আর ডিটেলে যেতে চাই না।

-- বেড়াতে যাবি যে বলছিস, কে ওসব রাঁধবে ? ওরা খাবে কী ?

-- ওরা খাবে বলে আমি বেড়াতে যাব না ? খাক না কিছুদিন লোকের হাতের জল পোস্ত, মাছের ঝাল, সড়সড়ি আর গড়গড়ি -- আরও বুঝবে, পকেটে কুলোলে হাতখরচটা বাড়িয়ে দেবে। এর চেয়ে বেশি আর কী করতে পারে চন্নন বরাট। শেফের মাইনেটা তো আর দিতে পারবে না।

-- কেন ? তোর লোক কিছু শেখেনি ?

-- কেন শিখবে না ? ওই তো বললুম -- ওইসব পারে। আমার সিক্রেট আমি কারও কাছে ফাঁস করি না। তোমাদের কাছে করতে পারি। খালি মালবিকাদি ছাড়া।

কেন ? কেন ? মালবিকাদি ছাড়া কেন ?

মুচকি হেসে শিল্পী বলে -- মালবিকাদি ছাড়া তোমরা আর কেউ ট্রাই-ই করবে না। কাজলাদি রাঁধবে মুর্গ মুসল্লম ? রঞ্জুদি রাঁধবে পসিন্দা কাবাব ? সুমিতাদি রাঁধবে ফিশ বলস ইন তোমিয়াম ? ডাক ফিলে ইন হোয়াইট সস উইথ হোয়াইট ওয়াইন ? তাহলেই হয়েছে। যাই হোক। শিল্পীর বিশ্লেষণ শতকরা শতভাগ ঠিক। সুমিতার প্যাশন হল সাইকো অ্যানালিসিস আর চা। চা-টা সে খুব ভাল রাঁধতে পারে, কারণ পারতে চায়। আমি বরং দোকান থেকে পসিন্দা কাবাব আনিয়ে খেতে খেতে দু-চার পাতা লিখে

ফেলব। তা ছাড়া আমার কথা হল, যে জিনিস পয়সা ফেলতে কিনতে পাওয়া যায়, সে জিনিস বাড়িতে তৈরি করতে যাব কেন রে বাবা ? সে জায়গায় চারটি ছোট গল্প লিখলে হাতে কিছু পয়সাকড়ি আসে। আর কাজল ? মুর্গ মুসল্লমের নাম শুনলে কাজলা স্রেফ এক পুঁটলি শাড়ি একটু গন্ধ সাবান আর তোয়ালে নিয়ে গৃহত্যাগ করবে।

যাত্রার দুদিন আগে ফোন বাজল। আমার কেমন একটা অদ্ভুত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে, তাই দিয়ে আমি বুঝতে পারি কোনটা অন্য ফোন, কোনটা আমার বন্ধুদের ফোন। নিরুপম ধরছিল, আমি বলেছিলুম -- বৃথাই যাচ্ছ ওটা আমার ফোন। ঠিক -- ধরেই নিরুপম গড়াই হতাশ মুখে বললেন, তোমার কমরেড। আমার গড়াইটি আবার মার্কসিয় ভাষায় কথা বলেন।

ধরে দেখি -- একেবারে কমরেড-ইন-চিফ বা কম্যান্ডার-ইন-চিফ। মালবিকা সান্যাল।

-- কী স্থির করলে -- যাচ্ছ না ? বরের অমত ? আমি বলি।

মালবিকাদির খসখসে গলা ভেসে এল -- মানে ? কবে বলেছি যাচ্ছি না ? বরের অমত ? দ্যাখ রঞ্জু -- খাবার থালা অর্থাৎ লাঞ্চ-ডিনার-ব্রেকফাস্ট-এর মেনু ছাড়া আর কোনও বিষয়ে আমরা পরস্পরের মতামতের তোয়াক্কা করি না।

-- কী করে জানব বল ভাই, অনেকেই তানানানা করছে, বর দেখাচ্ছে !

-- যারা বর দেখাচ্ছে তাদের তুই সোজা বর্জন কর। শোন, কয়েক রাউন্ড ধূপকাঠি, দেশলাই আর গোটা চার স্ক্রাবার নিস। কেন জিজ্ঞেস করে আমায় লজ্জা দিস না, কেন না আমার বন্ধুদের বুদ্ধিশুদ্ধির ওপর আমার আস্থাটা এখনও আছে।

আস্থা আছে মালবিকাদির। আমি কিন্তু আস্থার কারণ কিছুই খুঁজে পেলুম না। কারণ বেড়াতে গিয়ে স্ক্রাবার নিলে কী সুবিধা হবে তা আমার বোধগম্য হল না। তবে আদেশ পালন করতে আমি সবসময়ে খাড়া। কেন না আমি জানি আমি সব জানি না। কিছু কিছু জানি মাত্র। এবং অন্যরাও সব জানে না কিছু কিছু জানে নিশ্চয়ই। জানাগুলো মিলিয়ে নিয়ে একটা জ্ঞান-ব্যাঙ্ক তৈরি করতে আমার কোনও আপত্তি নেই।

-- শোন, মালবিকাদির গলা আবার ভেসে এল -- খাবার-দাবার নিতে গিয়ে যেন আবার কেলো করিসনি।

-- কেন ? কেন ?

-- তোর খাবার-দাবারের কনসেপ্ট হল বিস্কুট আর পাঁউরুটি। বড় জোর বাদাম। ঠিক ?

-- একদম।

-- তাহলে বুঝেছিস। তবে তোর হোমিওপ্যাথির হলুদ রঙের খোপ খোপ বাক্সটা আনিস।

-- অন্য ওষুধ -- ধরো মলম, ব্যথাহারী ট্যাবলেট। অ্যান্টাসিড ... ভাবিসনি। বেসিক ওষুধগুলো সুমিতা নেবে।

ব্যাস, আমি ঝাড়া হাত-পা হয়ে গেলুম। গোটা তিন চন্দন ধূপের প্যাকেট, গোটা দুই দিয়াশলাই, হলুদ রঙের খোপ খোপ হোমিওপ্যাথির হাতবাক্স আর মালবিকাদির বিশেষ ফরমাশ -- স্ক্রাবার। জামা-কাপড়, তোয়ালে, সাবান এসব আশা করি যার যার রুচিমতো। এ জায়গায় যে কোনও ফরমান জারি করা হয়নি এই-ই রক্ষা।

(৩)

তা ট্যাক্সিতে উঠলুম তিনজনে। মানে গড়াই ফ্যামিলি। আমাকে সি অফ করতে যাচ্ছেন -- কাজলাটা হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়ির কথা বলছিল। কোন কালে কলেজ জীবনে এক্সকার্শন করতে বড় ঘড়ির তলায় সব সমবেত হত, সেই মান্ধাতার আমল। ধ্যাঃ, বলে সুমিতা ওসব ছেলেমানুষি নাকচ করে দিয়েছে। আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে ফটোকপি টিকিটের। আসলগুলো সুমিতার জিম্মায়। কেন না ওই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ট্রাভলদার।

প্ল্যাটফর্মে এসে দেখি সুমিতার জাহাজি কাউন্টারপার্ট ছাড়া আর সবার হাজির। চন্দন বরাট-এর শুকনো মুখ, যদিও সে খুব হন্তদন্ত হয়ে দু নং স্লিপার কোথায় দাঁড়ায় কুলিদের জিজ্ঞেস করছে। দু নং স্লিপারের খোঁজ করতে সে তার মাথা কাটা যাচ্ছে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। গঙ্গাপ্রসাদ মশাই এমন উদাসীন অথচ সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যে সে একখানা দেখবার জিনিস। যেন পরীক্ষার হলে ইনভিজিলেশন দিচ্ছেন। আপাতদৃষ্টিতে নিজের কাজে মগ্ন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে নজর আছে কাজলরেখা তাঁর অমূল্যনিধিটি অতিরিক্ত উৎসাহে সব ভন্ডুল করে দিচ্ছেন কিনা। বিকাশকান্তি মুখে সিগার নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে সব পরিদর্শন করছেন। তাঁর ড্রাইভার অদ্ভুত ধরনের মালপত্র বার করছে গাড়ি থেকে। তবে আসল মালাটি দেখে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ। কাঁচাপাকা বয় ছাঁট একটু বেড়েছে, মালবিকা সান্যালের পরণে গেরুয়া সিল্ক, গলায় রুদ্রাক্ষের লম্বা মালা, ছোট তুলসির কন্ঠি। হাতেও রুদ্রাক্ষের মালা, আসল কি নকল জানি না। কপালে একটি মোটা লম্বা চন্দনের টিপ। যাকে তিলক বলে। এমন বেশে মালবিকাদিকে কখনও দেখিনি। আমি পর্যবেক্ষণের পক্ষে। কিন্তু কাজলার তো কোনও কৌতূহল পেটে থাকে না। সে বলে উঠল -- এই মালবিকাদি, তুমি কি ফর গুড ?

-- মানে ?

-- গৃহত্যাগ করছ ? বিকাশকান্তিদা টেক কেয়ার ! আমি ভাল বুঝছি্হ না।
বিকাশকান্তিদা সিগারের পাশ থেকে জবাব দিলেন -- আমি ভ্যালই বুঝছি।

রহস্যকান্তি হয়ে থাকে মালবিকা সান্যাল।

শিল্পী যথারীতি তার জিনস ও টপে সরলরেখাটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁটে কড়া লিপস্টিক, হাতে স্প্রিং-এর মতো কী একটা স্টিল রঙের জড়ানো। কান থেকেও ওইরকম স্প্রিং ঝুলছে। গলার সঙ্গে দেখি একটা পাঁচকোনা স্টিকার লাগানো। ও ; হো, ওটা লকেট। আর হারটা গলার রঙের সঙ্গে মিশে গেছে বলে ঠাহর হচ্ছিল না। কাজল তার মাথার কোঁকড়া চুলগুলিকে মেরে পাট করে একটা বড় খামচানো ক্লিপ দিয়ে মাথার সঙ্গে এঁটে রেখেছে। নো শাঁখা-পলা। খালি দু-গাছি ফলস সোনার বালা ও একটি সরু আসল 'সোনার লোহা' তার কবজি আঁকড়ে আছে। কেন না ওইটিই তার

ভুন্ডিলমুনির প্রাণভোমরা। খুলেছ কি ভুন্ডিল গেছেন। শাড়িটি সে নানান জায়গায় পিন করে গাছকোমর বেঁধে পড়েছে। সিনথিটিক শাড়িই, না হাফ-সিল্ক বুঝলুম না। কিন্তু টাঙাইলের ধাঁচের ডিজাইন। কাজলাকে যতই বল বা আর ঠাট্টা করো টাঙাইল সে কভ্ভি ছড়বে না। সুমিতা একটা ঢোলা প্যান্টের সঙ্গে একটা ঢোলা টপ পরেছে। তাকে আরও বেঁটে দেখাচ্ছে। তার ভ্রূক্ষেপও নেই। আভরণহীন, রংচংহীন, ম্যাটার অব ফ্যাক্ট সুমিতা। কু-ল। শা-ন্ত।

তবে আমার দিকে চেয়ে শিল্পী চোখ মটকালো -- এত অসভ্য। এই তো আরও এত বন্ধু রয়েছে তারা তো কেউ এরকম কিচ্ছু করেনি। একটা লম্বা সালোয়ার কামিজ পরেছি। রীতিমতো বুটিক থেকে কেনা। ফিটিং, কিন্তু আলগা। গলায় জড়িয়ে নিয়েছি চুননি। আমার হাতে, কানে, গলায় কোথাও কোনও গয়না নেই। কেন না শোবার সময়ে এসবে বড্ড অস্বস্তি হয়। আর আমি তো ঘুমোতেই যাচ্ছি। এত সব সজাগ নৈশপ্রহরী থাকতে আমার ভাবনা কী ! চাইলে খালি পালসেটিলা ৩০ কি আর্নিকা ৬ বার করে দেব, আর হ্যাঁ সেই প্লাস্টিক স্ক্রাবার ... ব্যস আমি কম্মের ধুচুনি এদের মতে, আমার আর কোনও কাজ নেই।

আরে ! কোথায় গয়া এতো দেখি দুন এক্সপ্রেস। নিরুপম গম্ভীর মুখে বলে -- দুনও ভাল ট্রেন নয়। মুখখানা একেবারে ব্যাজার।

শান্ত বলে -- ডাকাতি হয়, বাবা ?

-- আহ্ ! বাবা হাঁক ছাড়লেন, চাপা গলায়, যেন ডাকাতরা আশেপাশেই আছে। শুনতে পেলেই উৎসাহ পেয়ে ছোরাছুরি শানাতে শুরু করবে।

আমি নির্লিপ্ত গলায় বলি -- ডাকাতরা কমিউনিস্টদের স্ত্রীদের কিছু বলে না।

তাহলে শিল্পী মাসিকে ...

-- শিল্পী মাসি কারাটে জানে !

-- মালবিকামাসি ?

-- গুরুমাদের ওরা কিছু বলে না।

-- তবে সুমিতামাসি ? -- কাউকে না কাউকে ডাকাতের হাতে না ফেলতে পারলে আমার পুত্রটির ঘুম হচ্ছে না দেখছি। গম্ভীর গলায় বলি -- সুমিতামাসি সাইকলজির লোক।

হুড়মুড় করে উঠে পড়ি। সামনে দিয়ে কত এসি কামরা চলে গেল। কাতর চোখে চেয়ে চেয়ে সবাই দেখলুম। সুমিতার কী মতলব সুমিতাই জানে। উঠে আরও এগোতে যাচ্ছি। সামনে সুমতা বলল -- হল্ট। দেখি একটা ছোট্ট কুপে এদিকে তিনটে ওদিকে তিনটে বার্থ। রীতিমতো দরজা দিয়ে আলাদা করা কুপে। ঢুকে বিজয়গর্বে সুমিতা বলল -- সস্তায় এসি ভ্রমণ। সস্তায় রিজার্ভেশন। ভূগোল ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে আমি এই সব মুলুকসন্ধান জেনেছি। রিল্যাক্স, শিল্পিতা রিল্যাক্স। বাক্সপত্তর সব সিটের তলায়, আপার বাঙ্কে চালান গেল। কাউন্টারপার্টরা বিষন্ন মুখে (আপাদৃষ্টিতে) নেমে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে মালবিকাদি আমার ঝোলাব্যাগ থেকে উঁকি দেওয়া ধূপকাঠি নিজের সিগারেট লাইটার দিয়ে ধরিয়ে নিয়ে অদ্ভুত কায়দায় জানলার ফাঁকে গুঁজে দিল। একখানা বাহারি আসন বার করে সিটের ওপর পেতে নিল। নিজের ঝোলা থেকে একটা সিল্কের গেরুয়া থান ঝুলিয়ে দিল কুপের ময়লা পর্দার ওপরে। তারপর জাঁকিয়ে বসল আসনটিতে। জানলার পাশে। ঝট করে বড় রুদ্রাক্ষের মালাটা গলা থেকে খুলে নিল। একেবারে এক্সপার্টের কায়দায় মালার রুদ্রাক্ষ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিড়বিড় করতে লাগল। জপ করছে। জপের ভাষাটা এইরকম। ... এবার তোরা যে যার সিটে বিছানা পেতে ফ্যাল, জমিয়ে বোস। যতক্ষণ না টিকিট-চেকার ঘুরে যাচ্ছে, মোটের ওপর এইরকমই চলবে। ছটা সিটই আমাদের। কিন্তু খালি যাচ্ছে দেখলেই চেকার ব্যাটা ঘুষ খেয়ে মোষ ঢোকাবে। বি কেয়ারফুল।

সুমিতা তার ব্যাগ থেকে একটা অ্যাত্ত চওড়া সেলোটেপ আর কাঁচি নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার কাছ থেকে সেই স্ক্রাবারও চেয়ে নিয়ে গেল। একটু পরে এসে বলল -- ডান মালবিকা-মা।

-- মালবিকাদি আবার কবে থেকে তোর মা হল ? আমি জিজ্ঞেস না করে পারি না।

মালবিকা-মা নামেই কমান্ডার-ইন-চিফের টিকিট কাটা হয়েছে। শিষ্যা পরিবৃত হয়ে মা-জননী তীর্থে যাচ্ছেন।

-- এই করে আটকাতে পারবি ?

-- না পারার কিছু নেই। আমাদের ষষ্ঠ-সঙ্গিনী ভক্তিমাতা ঠাকুরানী যে কোনও জংশন থেকে উঠতে পারেন। তাঁকে সময়-শিডিউল সবই দেওয়া আছে। কিন্তু জনসেবার কাজে তাঁকে বড়ই ব্যস্ত থাকতে হল।

-- শিল্পী বলল -- সেলোটেপ আর কাঁচি নিয়ে কোথায় গেল গো।

সুমিতা বলল -- কুপে থেকে বেরিয়ে একটু বাঁয়ে এগিয়ে করিডর শেষ হয়ে যাচ্ছে। দুদিকে দুই দরজা মধ্যিখানে তরজা বসে। জানিস কী ? তার ওদিকে দুদিকে দুটো টয়লেট আছে। সেটা পছন্দ হল, সেটাতে সেলোটেপ মেরে এসেছি। 'আউট অব অর্ডার' লেখা বেরিয়ে আছে। সেটাই আমাদের।

-- এভাবে আটকাতে পারবি ? আমার সেই এক প্রশ্ন।

-- দেখি পারি কিনা, না পারলে তখন দেখা যাবে। আউট অব অর্ডার নিয়ে সাধারণত কেউ প্রশ্ন তোলে না।

-- চেকাররা তো কমপ্লেন পাবে, তারাও না ?

-- তারাও কিস্যু জানে না ট্রেনের কন্ডিশন। যাক গে তোরা বৃথা ভাবিস না, কিছু হলে আমি সামলাবো। যখন টয়লেটে যাবি, দুজনে যাবি। একজন চড়চড় করে সেলো খুলে ঢুকে যাবি। একজন বাইরে উদাসমুখে দাঁড়িয়ে থাকবি। ভেতর থেকে 'ওকে' আসলে খুলে দিবি। ঢুকে যাবি। এবার অন্যজনের উদাস হওয়ার পালা। আর বেসিন ব্যবহার করে প্রত্যেকে স্ক্রাবার বুলিয়ে দিবি। মনে থাকে যেন।

জানি না বাবা সাইকলজির লোকেদের কান্ড-কারবার। এই জন্যে স্ক্রাবার ?

(৪)

ট্রেন ছেড়ে দিল। মালবিকাদি মালাটা কোলে কুণ্ডলি পাকিয়ে রেখেছিল। আমি বললুম -- কোল কুন্ডলিনী ! তা আইডিয়াটা বেশ। শেষ পর্যন্ত লোক ভাগাতে ভক্তিনী সাজা ! ভাল। ভাল।

সুমিতা অমনি বলে উঠল, দ্যাখ রঞ্জুদি তোর আইডিয়াগুলোর চেয়ে এ আইডিয়াটা আরও অনেক অভিনব, স্বীকার কর। বেরিয়েছে এই সাইকলজির মাথার থেকে। হুঁ হুঁ বাবা। চাই কি এ পথ বেয়ে তুই কোনও নতুন প্লটেও পৌঁছে যেতে পারিস। বেশ গাছপালা পুকুর-অলা নতুন একখানা প্লট।

শিল্পী হি-হি করে হেসে ব্লল -- আমার ফার্স্ট ক্লাস লাগছে রে সুমিতাদি। খালি একটাই প্রশ্ন। গুরুমা কামরায় নন-ভেজ চলবে তো !

সুমিতা বলল -- দওড়েগা দওড়েগা। আমি একজন সন্ন্যাসিনী দেখেছিলুম, প্রতি জংশনে তাঁর জন্য এক টিফিন ক্যারি ভর্তি খাবার আসছিল -- ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, টিফিন, ডিনার। সে এক এলাহি কান্ড। ভেজ-ননভেজ সব। আমাদের একবার বললেন -- প্রসাদ পাবেন নাকি ?

শেষকালে আবার নিজে খেয়ে পাতকুড়োনি দেবেন হয় তো ভেবে আমরা বলি আমাদের সঙ্গে খাবার আছে। থ্যাংক্স। সুতরাং আমরা জুলজুল করে দেখলুম আর উনি আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে কখনও চোখ বুজে জপ করতে করতে, কখনও চোখ খুলে জপ করতে করতে খেয়ে চললেন। একবার রামকৃষ্ণদেবের ঢঙে কী বললেন জানিস ? নিজের পেটটা দেখিয়ে বললেন -- এর পেটে বিশ্বপেট আছে। বিশ্বাত্মা পরিতৃপ্ত হোক। ওম্ শান্তিহ্। স্টেশনে স্টেশনে অন্য কামরা থেকে ভক্তরা এসে প্রসাদ পেয়ে যেতে লাগল। তখন অবশ্য বুঝেছিলুম -- সবটাই প্রসাদ। উনি খেয়ে প্রসাদ করে দেবেন না। সারি সারি মাংসের চপ, কচুরি, খাস্তা, গজা ভক্তদের হাতে চলে গেল। কী আফসোস ! কী আফসোস !

কুপেতে হাসির হুল্লোড় উঠল। আর ঠিক সেই সময়ে হালুম করে টি টি সাহেবের কালো কোট গেরুয়া-পর্দা ভেদ করে ঢুকে পড়ল। মালবিকাদির উপস্থিত বুদ্ধি আর সময়োচিত তাৎক্ষণিক তড়িৎ অ্যাকশন ও উপদেশ আমাদের বাঁচায়। হি-হি টাকে হ্লীং হ্লীং ওং হ্লীং হ্লীং-এ পরিণত করে মালবিকাদি তক্ষুনি, একেবারে হুঙ্কার দিয়ে। বাজখাঁই গলা বটে একখানা। আমাদের হাসি তাতে চাপা পড়ে যায়, হুঙ্কারে চাপা পড়া -- ওম বল, ওম বল বুদ্ধুরা'টাও সঠিক শুনতে পাই আমরা। এবং মালবিকাদিকে অনুসরণ বা করণ করি।

একটু থতমত খেয়ে টিটি চলেই যাচ্ছিলেন। সুমিতা যথাসম্ভব কর্তৃত্বপূর্ণ গলায় বলল -- কাজটা সেরে নিয়ে যান, ক্ষতি নেই।

-- মাফ করবেন। আপনাদের বিরক্ত করলুম -- ডিউটি ... সব চেক-টেক করে ভদ্রলোক ভক্তিভরে বললেন -- উনি কে ?

-- মালবিকা-মা, নাম শোনেননি ? -- ধমকের সুরে বলল সুমিতা।

-- হ্যাঁ না, মানে ... ঠিক ...।

সুমিতা বলল, একটু প্রসাদ পান ভাই। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ব্যাগের মধ্যে হাত চালিয়ে পি সি সরকারের কায়দায় একটি অনুপম খাস্তার কচুরি বার করে সে প্লাস্টিকের প্লেটে টিটি সাহেবের দিকে বাড়িয়ে ধরল। ভক্তি ও লোভভরে সেটি গ্রহণ করে -- যথাসম্ভব নিচু হয়ে মাকে প্রণিপাত করলেন টিটি।

-- প্রসাদম আশু ভক্ষ্যম্‌ম্‌ম -- মালবিকাদি হ্লীং থামিয়ে বলল।

ভদ্রলোক একটা কামড় দিলেন খাস্তায়। চোখ দুটি বড় বড় হয়ে গেল, তার পরেই আবেশে বুজে আসতে লাগল। তিনি পেছু হঠতে হঠতে বেরিয়ে গেলেন।

আমি বললুম -- ওতে কি সিদ্ধি দিয়েছিস নাকি ?

সুমিতা তখন আমাদের জন্য প্রসাদ সাজাচ্ছে। সাজাতে সাজাতে বলল -- আজ্ঞে না। গঙ্গারামের অর্ডারি খাস্তার কচুরি -- ভেতরে ব্যাসনের ভেজাল নেই। খেয়েই দ্যাখ না।

ব্যস। এইবারে আমরা জম্পেশ করে বসি, খাই আর আড্ডা মারি। টয়লেট গেলুম, সুমিতাই কায়দায়, ঝকঝক করছে একেবারে। অদূর ভবিষ্যতের কথা ভাবি না। একদিকের জানলার ধারটা মালবিকা-মা দখল নিয়েছেন, উল্টোদিকের জানলার ধারটা আমার। অনায়াসে পেয়ে গেছি। শিল্পী বললে -- আমার ভাই অত দিরিশ্য দেখার শখ নেই। জানলার ধারে বসি আর মুখের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে যাক ! সাত-আটদিনের মতো ফেশিয়ালের এফেক্টটাকে টিঁকতে হবে তো। হ্যাঁরে সুমিতাদি গয়ায় পার্লার আছে ? সুমিতা জবাবে বলল -- ভিডিও পার্লার এখন সব জায়গায়। তবে গয়াতে পিন্ড-পার্লারই বেশি।

মালবিকাদি বলে উঠল, ভক্তি শ্রদ্ধা ধর্মবিশ্বাস এসব নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে নেই সুমি।

সুমিতা বলল -- সর্বনাশ ! তুমি কি পার্মানেন্ট ভক্তি-মুডে চলে গেলে নাকি মালবিকাদি ? তাহলে আমাদের রাত্তিরের বিরিয়ানির কী হবে ?

শিল্পী বলল -- আহা তুমিই তো শোনালে বিরিয়ানিতে আর বা-তে কোনও বিরোধ নেই।

-- বা-টা আবার কী ! সুমিতা আকাশ থেকে পড়ল।

আমি বললুম -- বুঝলি না ? গুজরাটিতে মা-কে বা বলে শিল্পী টিভি সিরিয়াল থেকে শিখেছে। আর অনুপ্রাসে ওর বরাবরই খুব ঝোঁক। বিরিয়ানি আর বিরোধের সঙ্গে মা-এর চেয়ে বা-টাই ভাল খাবে -- এ আমাদের স্বভাবশিল্পী বন্ধুটি সাবলীলভাবে বুঝে নিয়েছে।

-- দ্যাটস ইট, বলে শিল্পী পাটা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে আমাদের কামরায় একটু আধটু উঁকিঝুঁকি শুরু হয়ে গেছে।

গলা খাঁকারি দিয়ে একজন কেউ খুনখুনে গলায় বললেন -- আসতে পারি ? বলে কোনও সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই ঢুকে পড়লেন। একটি বৃদ্ধ। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা। চোখের চশমার পেছনে দৃষ্টি ঘোলাটে।

ঢুকেই বললেন -- মাগো, প্রণিপাত হই। বৃদ্ধকে দয়া করো মা।

বিরিয়ানি-টানি রেঁধে সেসব ঠিকঠাক প্যাকিং করে প্লাস রিহার্সালে বোধহয় মালবিকাদির একটু ঢুল এসেছিল, জড়িয়ে জড়িয়ে বললে -- সুমি মা ওঁকে একটু দয়া দিয়ে দে তো মা ...।

সুমিতার চোখ একবার কপালে উঠল, তারপরি সে আবার তার ঝোলায় হাত ঢোকালো, বেরোলো একটি খাস্তা গজা।

-- দয়া নিন দাদা -- সুমিতা খাস্তা গজাটি বাড়িয়ে ধরল। ভদ্রলোক ছানি পড়া চোখে যথাসাধ্য ঠাহর করার চেষ্টা করলেন সুমিতাকে। গজাটি নিলেন। তারপরে বিনীত গলায় বললেন -- আজ্ঞে প্রসাদ তো গ্রহণ করবই। করে কৃতার্থ হব। কিন্তু একটু দয়া করবেন না মাতাজী ?

সুমিতা মোলায়েম গলায় বললে -- প্রসাদই দয়া, দয়াই প্রসাদ। মা এখন ধ্যানস্থ, আপনি দয়া করে আসুন।

খপখপ করে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

ঠিক পাঁচ মিনিট পরে দুই মোটাসোটা ভদ্রমহিলা, গেরুয়া ঠেলে ঢুকে পড়লেন, একেবারে আমাদের ব্যুহ ভেদ করে মালবিকাদির পায়ের কাছে থ্যাপাস করে বসে পড়লেন কামরার মেঝেয়। -- মা মা, দেখা যখন পেয়েছি তখন ছাড়ব না। মালবিকাদি নিঃসাড়। একজন বললেন -- মাকে একটু গান শোনাবো ভাই ? তাঁর চোখ আমার দিকে। আমি বললুম -- নিশ্চয়ই। সুমিতা আমার দিকে কটমট করে তাকাল। কিন্তু আমারও তো একটা রোল আছে, আমিই বা ছাড়ব কেন !

ভদ্রমহিলা কেমন বাজখাঁই মতো গলায় গান ধরলেন -- আমি তোমায় ছাড়বো না মা যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক। ওঁরা গান গাইছেন, আমি আঙুলে গুণে গুণে উর্ধ্ব নেত্র হয়ে জপ করছি, বুঝতে পারছি সুমি-মা আমার দিকে কটমট করে তাকিয়েই চলেছেন। তাকিয়ে চলেছেন, কিন্তু কিস্যু করতে পারছেন না। হায় !

গানটি দু-তিনবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গেয়ে শেষ করতেই ঝুলির থেকে সুমিতার হাত বেরিয়ে এল। হাতে দুটি খাস্তার নিমকি। প্রসাদ গ্রহণ করুন দিদিরা। মা ধ্যানস্থ। ওঁর ব্যাঘাত ঘটাবেন না।

-- দয়া করবেন না মা ? সংসারের জ্বালায় যে জ্বলে পুড়ে মরলুম মা !

শিল্পী হঠাৎ তড়াক করে উঠে বসল -- শুনুন দিদি, দেখতেই পাচ্ছেন আমরা মায়ের গৃহী ভক্ত। আমাদেরও জ্বালা-যন্ত্রণা আছে। কিন্তু সে সব নিয়ে ওঁকে বিরক্ত করতে আমরা আসিনি। ওঁকে ওঁর সাধন-ভজন-ধ্যান-ধারনায় অবিচল থাকতে দিতেই এসেছি। উনি মুক্তিপথের পথিক কিনা।

-- আমরাও তো মুক্তিই চাই ভাই !

-- সে তো ছাত থেকে লাফিয়ে পড়লেই পাওয়া যায়।

সর্বনাশ ! এ তো কেলো করছে দেখছি। সুমিতার মুখ একবার লাল হচ্ছে একবার কালো হচ্ছে।

আমি তাড়াতাড়ি বলি -- উনি বলতে চাইছেন -- মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তো মুক্তি পেতেই পারি। মুক্তি চাই মুক্তি চাই বললেই তো হবে না। অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ। গৃহীদের এই-ই তো সাধনা, ভাই। সুমিতা বলল -- প্রসাদ গ্রহণ করুন। এখনই করুণা অনুভব করবেন দিদি। এখন দয়া করে আসুন। ওঁর অসুবিধে হলে স্বামীজী আমাদের বড়ই কুপিত হবেন।

সিঁদুরের টিপ, কাজল ধেবড়ে গেছে মুখময়, দুই মহিলা বোধহয় দুই বোন, প্রসাদ গ্রহণ করে ছোটখাটো মুক্তির স্বাদ নিতে নিতে দুজনে চলে গেলেন।

মালবিকাদি চোখ বুজেই বললে -- ভাগ্যে লেখিকা ছিল। সুমি-মা খাস্তাগুলি সে সব হরির লুঠ করে শেষ করছ, কাল খাবে কি ?

-- সে তোমায় ভাবতে হবে না -- সুমিতা বেশ কড়া গলায় বলল -- নিজে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মজা মারছেন আর থেকে থেকেই সুমি-মা, সুমি-মা।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে মালবিকাদি বলল -- তো তুই আমার জায়গায় এসে বোস না। দ্যাখ না মাতাজি-মির ম্যাও সামলাতে কেমন মজা। আয় আয়, আমার সঙ্গে ড্রেস চেঞ্জ কর। ড্রেস চেঞ্জ কর।

আমি শান্ত ধীর স্থির গলায় বলি -- কী করে করবে মালবিকাদি ! সুমিতার পেন্টুল তোমার দেহের মাঝপথে পৌঁছে থমকে যাবে যে ! তাছাড়া সুমিতার বিচ্ছুভাবের সঙ্গে তোমার বহুরূপে বহুরূপী তুখোড়-ভাবটাও বদলাবদলি হবে না। এখন যে পথ ধরেছো সেই পথে চলো বাছাধন। চলতেই হবে। আর শিল্পী খবরদার মুখ খুলবি না।

শিল্পী বলল -- তা হলে আমি একটা সিগারেট ধরাই। ভীষণ টেনশন হচ্ছে। ওই গানটার সময়ে মনে হচ্ছিল ধেই ধেই করে নাচি।

খবরদার -- মালবিকাদি বলে উঠল। খেতে হলে টয়লেটে যাও।

-- চলো না গো রঞ্জুদি।

আমি গ্যাঁট হয়ে বসে থাকি, উনি দশ মিনিট ধরে ফুঁকবেন আর আমি উদাসী হাওয়া হয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব -- সেটি হচ্ছে না। বলি টেনশন কমাবার সবচেয়ে সহজ উপায় -- ঘুমিয়ে পড়া। তা না পারিস তো মেডিটেশন কর। 'মেডিটেশন দাই নেম ইজ ব্লিস, আই'ল গো উইথ য়ু এনিহোয়ার, জাস্ট এনিহোয়ার য়ু প্লিজ।'

খুব সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে সুমিতা বললে -- কোটেশন ভর্তি করে এসেছিস নাকি মগজে ? আগেরটা তো রবীন্দ্রনাথ, এটা কার ?

-- আমি অম্লানবদনে বলি -- উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, আর কে ?

যাক ভুজুং ভাজুং দিয়ে রাতটা ভালই কাটল। বিরিয়ানি পর্ব সমাপ্ত হল। হটকেস ধোয়াধুয়ি হয়ে যথাস্থানে ঢুকে গেল। মুখ হাত ধুয়ে সব কিছুক্ষণ গল্প-সল্প হল। সারাক্ষণ নির্বাক হয়ে ছিল কাজলরেখা মিত্তির। কুপে দেখে একবার আনন্দ প্রকাশ করবার থেকে চুপ। যখন মালবিকাদির ওপর ভক্ত-আক্রমণ হচ্ছে, সে আমার পাশে বসে নিমীলিত নয়নে মৌরিভাজা খেতে খেতে কাগজ পাকিয়ে কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। চারপাশে যা হচ্ছে তাতে যেন তার কিছুই এসে যায় না। কাজলার ঝোলায় নানারকম উপাদেয় মুখশুদ্ধি থাকে, সব ওর দিদিমাসির করা। মৌরিভাজা, লেবু জরানো, আমলকি শুকনো, একরকম গুজরাতি মুগ ডাল মুগ-ডাল দেখতে মুখশুদ্ধি। যে কোন মুখসুদ্ধির মুশকিলই হল, একটু খাওয়া হলেই মনে হয় আরেকটু খাই। কাজলার মৌরিভাজা তৃতীয়বার চাইতে কাজলা ওইরকমই আধবোজা চোখে বলেছিল -- মুখশুদ্ধিং কণিকামাত্রেণ। আমি তখন থেকে অভিমানে অন্ধকার প্রকৃতির দিকে ড্যাবডেবিয়ে চেয়েছিলুম। জোনাক জ্বলছে, পাখা মেলে একটা সাদা পাখি উড়ে গেল, গরুর গম্ভীর গলায় গাঁ হাঁ, গাঁ হাঁ ডাক ভেসে এল কোত্থেকে। পয়েন্টগুলো সব টুকে রাখছিলুম, কেননা আমার পুজোর লেখায় ব্যবহারের উপযুক্ত যথেষ্ট বর্ণনা দরকার। উপন্যাস লিখতে গেলে বর্ণনা চাই। যা মোটামুটি স্থির, তারপর আছে সংঘটন, তাতেও বর্ণনা থাকছে কিন্তু তা চলমান, আর আর বিশ্লেষণ এবং শেষমেশ সংলাপ। বর্ণনায় আমি একটু উইক, তাই চারদিকে খেয়াল রাখতে শুরু করেছি। যখন কামরায় তারস্বরে গান হচ্ছিল, তখন কাজলা রীতিমতো তাল দিচ্ছিল। মানে অমি আর আমার বন্ধু এক পক্ষেই ছিলুম। তারপর আমরা কিছু না কিছু বলছি, কিন্তু কাজলা কিছুই বলে না। তখন আমরা ওকে চেপে ধরি -- কী রে ? তোর মুখ বন্ধ। এদিকে তোর মুখের ভরসাতেই আমরা এসেছি। হঠাৎ কাজলা কাঁদো কাঁদো মুখে বলে উঠল, তোরা আমার দুটো ভাবনা কাটিয়ে দে প্লিজ।

-- কী ভাবনা, কী ভাবনা ?

সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠি।

কাজলা বলে -- আটদিনের আট সেট ধুতি-পাঞ্জাবি গেঞ্জি আন্ডারওয়ার বার করে দিয়ে এসেছি, কিন্তু ১ ২ ৩ ৪ লিখে দিয়ে আসিনি তো ! যদি একটাই আট দিন পর পর পরতে থাকে ? -- পরাজয়, মস্ত বড় পরাজয় হয়ে যাবে আমার। তোদের

গঙ্গাপ্রসাদবাবুর মেনটেনান্সের খুব নাম ! মানে নামটা আমারই আর কি ! সব যদি এই তালে ফুট্টুস হয়ে যায় ?

-- এই কথা ? শিল্পী তার চোদ্দ হাজার টাকা দামের সেলফোন বার করে নম্বর টকটক টিপে যায়। তারপর বলে -- হ্যাঁ জামাইবাবু আমি শিল্পী কথা বলছি। ও কাজলদি এ যে জামাইবাবু নয় গো। কে এক গোপাল !

কাজল প্রায় ককিয়ে ওঠে -- এই ভয়টিই আমি করেছিলুম। এইটেই আমার দ্বিতীয় ভাবনা। আমি যাব আর গোপাল গেঁড়ে বসবে। কে জানে এটাই ও ইলোপ করার জন্য প্রশস্ত সময় ভেবে নিয়েছে কিনা।

শিল্পীর হাত থেকে ফোনটা কেড়ে নিয়ে আমি বলি -- কে গোপাল ? আমি রঞ্জুমাসি।

-- মাসি কি ? দিদি বলুন।

-- কেন দিদি বলব কেন ?

-- বারে, লেখকদের আমরা দাদা করে বলি না। যার যতই বয়স হোক সব দাদা। মেয়েদের বেলায় অন্যথা হবে কেন রঞ্জুদি। আমি যদি এখন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় মশাইকে শরৎ মেসো কি পিসে মশাই বলে ডাকি, সেটা কি ঠিকভাবে গৃহীত হবে ? অনুরূপভাবেই আপনি তীর্ণার মাসি হতে পারেন। কিন্তু আমি আপনাকে লেখিকা হিসেবেই চিনি। কাউন্ট করি। তাই আমি আপনাকে দিদিই বলব।

আমি বলি -- ঠিক আছে। তোমাকে একটা সিরিয়াস কথা বলছি শোন। কাজলা মাসির অনুপস্থিতিতে ইলোপমেন্টটা করো না।

-- ওহ্ হো রঞ্জনাদি আপনি লেখিকা হয়েও চরিত্র পড়তে পারেন না ? আমাকে আপনার ইলোপ প্রবণ মনে হয় আদৌ ? সত্যি বলুন তো !

সত্যিই বলি -- না, মনে হয় তুমি একটি পার্ফেক্ট কুটুস-কামড় টাইপ। কুটুস কুটুস কামড়াবো গর্তের মধ্যে সেঁধোবো। কিন্তু আমি তো আর মেয়ের মা নই ! মেয়ের মা ভাবনায় অর্থেক হয়ে গেছেন। এত রাতেই বা তুমি এ বাড়িতে কেন ?

-- কেন আর ? মেসোকে পাহারা দিচ্ছি।

-- মানে ?

-- তীর্ণা আর অনীক সিনেমা দেখতে গেছে, আমাকে পাহারায় রেখে গেছে। মেসোমশাই অভিধান লিখছেন, আর আমি ওঁকে খাবার কথা, জল পান করার কথা, জলবিয়োগ করার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি, রঞ্জনাদি। ওরা এলে, খাবার নিয়ে আসবে, আমরা একসঙ্গে খাব, তারপর আমার ডিউটি শেষ।

আমি বলি -- একটা এক্সট্রা কাজ করে ফ্যালো দেখি, কাল থেকে পরপর আটদিনের তারিখ লিখে ফেল, ছোট ছোট কাগজে, বড় বড় করে। তারপর আলনায় দেখবে আট সেট ধুতি-পাঞ্জাবি আছে। পরপর তাতে তারিখগুলো আটকে যাও। এবং এর পরেও, তীর্ণা এলে, তাকে বোল, অনীককেই বা ছাড়বে কেন ? তাকেও বলো বাবা যেন তারিখ মিলিয়ে কাপড়গুলো পরে, ধোপার বাক্সে সেগুলো ফেলে দ্যান।

-- বাপ রে -- গোপাল বলল -- এইভাবে কাজলামাসি মেসোকে নিজের ওপর ডিপেন্ডেন্ট রেখেছেন ? পাতাখোরদের সঙ্গে তো কোনও তফাতই নেই। মেসোর উইথড্রয়াল সিমটম হলে কী করব দিদি ?

-- বেশি ইয়ার্কি মেরো না -- আমি ধমক দিই -- মাইন্ড ইয়োর ওন বিজনেস।

গোপালের সঙ্গে আলাপচারিতার বিশদ বৃত্তান্তে আমি যাই না। খালি তীর্ণা নেই, গোপাল আছে। তীর্ণা এলেই গোপাল থাকবে না এইটুকু শুনেই কাজল তিন চতুর্থাংশ ঠিক হয়ে যায়। তবে গঙ্গাপ্রসাদবাবুর ব্যাপারে ওর অস্বস্তিটা থেকেই যায়। বিরিয়ানির পর কাজলাই আমাদের তার স্পেশাল পান খাওয়ায়, ছোট ছোট মিঠে পান, তাতে নানারকম মশলা, চুন আছে কিন্তু খয়ের নেই। মাংসর স্বাদটা জিভ থেকে চলে গিয়ে বেশ সুন্দর একটা সাত্ত্বিক অবস্থাও হয় আমাদের। অতঃপর নিচের দুই বার্থে কাজল আর মালবিকাদি, মাঝের দুই বার্থে, আমি আর সুমিতা, আর একদিকের আপার বার্থে তড়াং করে উঠে যায় শিল্পী। খুব ভোরে ট্রেন পৌঁছবে গয়ায়। বেশি আড্ডা মারা ঠিক নয়।

(৫)

ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে জিপ চলেছে। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। কাজলা হেঁকে উঠল -- যদি সামনে একটা ষাঁড় থাকে জিপটাকে ধাক্কা দেবে, তখন জিপটা আবার ষাঁড়টাকে ধাক্কা দেবে -- তারপর ষাঁড়টা আবার ...

-- এই চুপ করবি। মালবিকাদি আরও জোরে হেঁকে উঠল। সবাইকারই দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে এত ঠান্ডা। মুখে যেন ছুরি বিঁধছে, কানগুলো নেই, নাক কান-কাটা হয়ে গেছি। শিল্পী অবশ্য একটা বিলিতি মাঙ্কি ক্যাপ পরেছে। কিন্তু নাক দিয়ে তার ইতিমধ্যেই জল ঝরতে শুরু করেছে। কথা বললেই মুখের সামনে মেঘ নেমে আসছে।

হঠাৎ ঝড়াংঝড় করে জিপ থেমে যায়। মালবিকাদি কাজলা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছে -- ষাঁড় ?

জিপচালক বললে -- আশরম আ গয়া। উতার জাইয়ে। সামান সব পিছে জায়েঙ্গী।

দুজন বাবাজী দাঁড়িয়েছিলেন, আমাদের ঘর দেখিয়ে দিলেন। ও হরি, ঘরে চারটে খাটিয়া, ব্যস আর কিচ্ছু নেই। প্যাসেজ দিয়ে গিয়ে পরপর বাথরুম। গিয়ে দেখি বাথরুম তো বাথরুমই, কল আর তলায় বালতি-মগ। অর্থাৎ ল্যাট্রিন আলাদা। কী বিপদ ! এ ব্যবস্থাটা কার ? -- শিল্পী হাঁকল। সুমিতা জোর গলায় জবাব দিল -- আমার। ভ্র ভ্র ভরমণ করবে আর তোমার বাড়ির বিছানা, হিটার, টয়লেট সঙ্গে সঙ্গে যাবে তবে তোমার বব্বরাটের সং সং সঙ্গে যেও। -- বু বু করে কাঁপতে কাঁপতে বলছে, তাই মাঝে মাঝেই অক্ষরগুলো ডবল হয়ে যাচ্ছে।

মালবিকাদি বলল -- রোদ একটু উঠলেই রওনা দেব, কিক্‌কীরে সুমিতা সব রেডিড তো ?

সুমিতা বলল -- সস্‌সব। রেডিড, যাও সব।

কাজলা বলল -- খিখ্‌খিদে পেয়েছে।

আমি বললুম -- হাত মুখ ধুধুধুতে হবে নাকি ?

শিল্পী বলল -- নেভ্ভার, প্রব প্রববাসে নিন্নিয়নো নাস্তি।

সুতরাং খাটিয়ায় বসে আমরা খাস্তা বংশ ধ্বংস করি। এবং হাঁ করে রোদ ওঠার অপেক্ষায় থাকি। সবচেয়ে পিটপিটে শিল্পী কিন্তু ঠিকই হাত ধুয়ে এসেছে। বলছে আমার হাত আর নেই, কাট্টা গেছে।

সুমিতা একটু পরেই বেরিয়ে বাবাজিদের সঙ্গে গাড়ির কথা বলে এল। এগারোটার আগে নাকি বেরনো নিরাপদ নয়। পিন্ডদাতাদের শীত বোধ নেই, তাঁরা ভোর থেকেই দলে দলে বেরিয়ে পড়েছেন। ঘন কুয়াশায় গাড়ি বার করলে তাঁদের দু-চারটি মারা পড়তে পারেন।

দুজন বাবাজি এসে জিজ্ঞেস করলেন -- আপনাদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে নাকি মায়েরা ?

মালবিকাদি সাধু ভাষায় বলল -- কিছু মাত্র না। চিন্তার কোনও কারণ নেই।

-- তবে গয়া না দেখেই চলে যাবেন ? গয়ায় রয়েছে শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম, রয়েছেন অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীমাতা, যাঁর প্রাচীন নাম নৈরঞ্জনা, যাঁর তীরে বুদ্ধদেব সাধনা করেছিলেন, রয়েছে গয়াসুরের পাষাণময় দেহ ... এখানেই শ্রীচৈতন্যদেব ...

সুমিতা তাড়াতাড়ি বলে -- ফেরবার সময়ে দেখে নেব। আমরা বৌদ্ধ তো ! তাই বোধগয়ায় ...

-- বৌদ্ধ ? ওই মায়ের গলায় যে একাধারে তুলসি আর রুদ্রাক্ষ দেখছি, হরি হর একই সঙ্গে বসবাস করছেন ...

আমি বলি -- উনি সনাতনধর্মী। আমরা কেউই ধর্মের ব্যাপারে কট্টর নই, সাধুজী, শেষ পর্যন্ত তো সেই একই ব্রহ্ম, পরাৎপর, শেষ পর্যন্ত সেই মোক্ষ, সেই নির্বাণ, একই কথা নয় কী ?

-- আপনাদের মতো আধুনিকাদের মুখ থেকেএ সব শুনে বড় ভাল লাগল। আমরা যে মনে করি আধুনিকা মানেই অ্যান্টি-রিলিজন, তা নয়।

-- কখনওই না সাধুজী। কত জিনস পরা এমন কি সিগারেট খাওয়া নারী যে তীর্থে তীর্থান্তরে ঘুরছে তীর্থঙ্কর হয়ে একটু ঈশ্বরানুভূতি একটু প্রসাদের আশায় তা যদি জানতেন ... আমরা তো কিছুই না।

সাধু দুটি নমস্কার করে বললেন -- বড় আশা জাগিয়ে দিলেন মা। হতাশ হয়ে ভাবতুম ভারতমাতা তুমি কি সেই মাতামা ? সব পাশ্চাত্য পোশাক, পাশ্চাত্যবুদ্ধি ও ধর্মহীনতার দিকে ঝুঁকেছে। ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে। তা নয় তা হলে ?

আমি সুমিতাকে দেখিয়ে বলি -- এই তো ইনি একটি কজেলের অধ্যাপিকা, সাইকলজির লোক। প্রেজেন্ট জেনারেশন কীভাবে ধ্যানযোগ, ভারতাআর খোঁজ, আত্মানুসন্ধান ইত্যাদি করছে -- ইনিই ভাল বলতে পারবেন।

মানে আমার স্টক ফুরিয়ে গেছে। বল সুমিতার কোর্টে স্ম্যাশ হয়ে চলে গেল।

কিন্তু বাবাজীরা আর দাঁড়ালেন না। কাজ আছে। সবিনয়ে মাফ চেয়ে চলে গেলেন।

মালবিকাদি বলল -- ভাগ্যে লেখিকা সঙ্গে ছিল তাই তোদের কেলোগুলো সামলে দিচ্ছে। হ্যাঁরে সুমিতা, বোধগয়া দেখতে হলে বৌদ্ধ হতেই হবে এ জ্ঞানটি কোত্থেকে জোটালি ? বেশি মুখ খুলিসনি, সব ভণ্ডুল করবি দেখছি।

সুমিতা মস্ত বড় একটা জিভ কাটল। সঙ্গে সঙ্গে আবার জিভ গুটিয়ে নিল। ঠান্ডায় জিভ জমে যাচ্ছে, বোধহয়। বলল -- দ্যাখো মালবিকাদি, আমি বৌদ্ধ না হলে তো তীর্থে তীর্থে তীর্থঙ্কর, ঈশ্বরানুভূতি, প্রেজেন্ট জেনারেশনের ধ্যানযোগ, ভারতাআর খোঁজ, আত্মানুসন্ধান এসব শোনা যেত না। রঞ্জুদি যে রকম লেকচার দিচ্ছে যে বাবাজিদের মতো আমার মনেও যে আশা জেগে উঠছে গো !

-- মেলা বকিসনি -- মালবিকাদি ধমকে উঠল -- বেশি বকলেই ফালতু কথা বেরিয়ে আসে মনে রাখিস।

-- বেশ আমি এই কুলুপ আঁটলুম মুখে -- সুমিতা মুখটা তোম্বা করে বলল।

-- আমি কিন্তু কুলুপ আঁটব না। রঞ্জুদিকে বলতে হবে 'এমন কি জিনস পরা সিগারেট খাওয়া নারী' বলে ও আমাকে কটাক্ষ করল কেন ? -- শিল্পী ঝেঁঝে উঠল।

মালবিকাদি আবার বললে -- মেলা বকিসনি। নিজেরা কেলো করবে, আবার কটাক্ষ রুদ্রাক্ষ ... থাম।

মা আমাদের ট্রেনযাত্রায় কামরা সামলেছেন। মায়ের কথা অতএব শিরোধার্য। সকলেই মেনে নেয়।

(৬)

রোদ ঝলমলে দুপুর, সাড়ে বারোটা যাকে কলকাতার সাড়ে আটটা সকাল বলে মনে হচ্ছিল -- সেই সময়ে আমাদের যাত্র শুরু হল। গুজরাতি পদ্ধতিতে তৈরি মেথি পরোটা ও আচার দিয়ে আমরা ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছি। পথে কোথাও যাতে অন্নবস্ত্রাভাবে আমরা কাতর হয়ে না পড়ি তার পুরো ব্যবস্থা করেছেন দুই মা মালবিকা-মা, সুমি-মা। থ্রি চিয়ার্স ফর মাতাজী।

খুব উত্তেজিত, উল্লসিত যাত্রার ঠিক দশ মিনিটের মাথায় ঘটনাগুলো পরপর ঘটল। এপাং ওপাং না করে একেবারে বিনা নোটিশে ঝপাং করে গাড়ি পড়ল গর্তে। ক্যা হুয়া ড্রাইভারজী ?

-- কুছ নেই, ঘাবড়াইয়ে মৎ। কয়েকবার ঘড়ঘড় করে বৃথা চেষ্টা করলেন ড্রাইভারজী, গাড়ি কবার তেড়ে উঠল, তারপর একটু গিয়েই আবার। এবার শব্দ হল ঝপাস। এবং সঙ্গে সঙ্গে জানলার দুপাশে বসা কাজল আর শিল্পী, সামনে ড্রাইভারজীর পাশে বসা মালবিকাজীর অভিষেক হয়ে গেল -- ঘন কাদা জলে। শিল্পী-কাজলার মুখ কাদার পুরোপুরি অন্তরালে, মালবিকাজীর কাঁচাপাকা মাথা ও বাঁ গাল অভিষিক্ত। আমি আর সুমিতা বেঁচে গেছি। কোলে খানিকটা পড়েছে। কিন্তু মুখশ্রী অটুট। আহ্লাদিত হৃদয়ে

আমরা দুজন, চটপট তোয়ালে বার করি। উৎকট গোবরের গন্ধ। গোবরও নয় এ হল ষণ্ডবর। ষন্ডবর ষন্ডচোনায় ঘন করে গুলে গর্তে ভরে রাখা হয়েছিল আমাদের গুবলেট করবার জন্য। মালবিকাদি মুখ ভেঁটকিয়ে, ব্যাগ থেকে টয়লেট রোল বার করে দিল। সত্যিই তোয়ালে দুটো ফেলে দিতে হত। মোছা হচ্ছে আর দুই মক্কেল ওঁয়া ওঁয়া করে উঠছে। ড্রাইভারজী তখন আরও দুটি ষণ্ডামার্কা সঙ্গে গাড়ি তুলছেন। আমরা নেমে নিকটবর্তী দোকানের কাছে পানিপ্রার্থী হই। আমার প্যাকেট থেকে ট্রাভলিং সাবান বেরোয়, সুমিতার প্যাকেট থেকে ওডি কোলোন। সুষ্ঠুভাবেই সব হয়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সব হলেও তো সব হয় না। শিল্পী-কাজলা দুজনের জামাকাপড় থেকে তো আর দাগ ও গন্ধ তোলা যাবে না যতক্ষণ তারা ধোপার বাড়ি না যাচ্ছে। অজস্র জলপ্রপাতে দুজনেই ভিজে ঠকঠক করে কাঁপছে। আমি প্রতিষেধক হিসেবে রাসটক্স সিক্স বার করে তিনজনকেই দিই। বলি -- তোদের কত করে বললুম, শিল্পী রোগা কম জায়গা নেবে মাঝখানে বোস শুনল না। কাজলা তোকে কত করে বলেছিলুম ভাল শাড়ি পরিস না। কেউ শুনলি না, এখন হল তো ?

কাজলা গম্ভীর মুখে বলল -- তুমি কি মনে মনে করেছ তুমি আমার জায়গায় থাকলে আমি এরকমই উল্লসিত হতুম !

শিল্পী বলল -- প্রতিশোধ চরিতার্থ হওয়ায় উজলে উজলে উঠছে দুজনে। ছিঃ।

সুমিতা ওদের কথায় কান না দিয়ে এবার জানলার কাচ সব বন্ধ করে দেয়। ওর স্টক থেকে দুটো গরম চাদর দুজনকে দিয়ে বলে, যথাসম্ভব মুড়িসুড়ি দিয়ে বোস। তাহলে ঠান্ডাটা আটকে যাবে। যত শিগগির পারা যায় জামাকাপড় বদলাতে হবে। তার মুখ বেশ গম্ভীর। সে ভয় পেয়ে গেছে।

আবার চলেছি। ঘন বাজার। জিলিপি রাবড়ি পানতুয়ার অঢেল দোকান। বলব কি প্রত্যেকটি জিলিপিতে মাছির চাদর। মাছিময় খাদ্যদ্রব্য। শিল্পী, চাদরের ঘোমটার ভেতর থেকে বলল -- আমার ভীষণ বমি বমি পাচ্ছে। বিরিয়ানির খালি ডাব্বা সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে ধরিয়ে দিল সুমিতা।

-- আর কেলেঙ্কারি করিসনি।

এখন আমি আর সুমিতা পাশের দিকে বসেছি। সিক্ত দুজন মাঝখানে। দূর থেকে বিষ্ণুপাদ মন্দির দেখি, দেখি ফল্গুর বালিময় খাত, মনে একটু একটু কবিত্ব আসতে শুরু করেছে, এমন সময়ে গাড়ি আবার টাল খেল। চমকে দেখি কাচের বাইরে একটি ষন্ডমুখ। নিরীক্ষণ করে আমাকে দেখছে। তারপর গলা নিচু করে শিং বাগিয়ে দিল এক ধাক্কা। ধাক্কাটা লাগল কাচের দিকে গাড়ির দরজায়। ঝং ঝং করে উঠল। অকুতোভয় ড্রাইভার কতকগুলো গোঁত্তা দিয়ে সামনে চলতে শুরু করল। কী ব্যাপার ? না -- সামনে শালো বৈঠ রহা থা।

-- আপ দেখা নেই ?

-- আরে কিধর দেখুঙ্গা ? ইধর উধর সব শালো ঘুমতা ফিরতা গাড়ি টুটাতা, প্যাসেঞ্জার মারতা।

সর্বনাশ গাড়ি ভাঙা প্যাসেঞ্জার মারা এই ষণ্ডকুলকে কেউ কিচ্ছু করে না ?

ড্রাইভারজি জানালেন -- জিলাবি খিলাতা সব বেওকুফ। নেহি তো দুকান মে ঘুঁস জায়গা।

গয়া পেরিয়ে এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। এ যাত্রা বেঁচে গেছি। এবং এখন গয়ার প্রধান সমস্যা যে ষন্ড, দ্বিতীয় সমস্যা যে মাছি, তৃতীয় সমস্যা যে গর্ত, এ বিষয়ে বেশ একখানা ছোটখাটো আর্টিকল কি রম্যরচনা আমি লিখে দিতেই পারি। এই উপাদান আমাকে দেওয়ার জন্য আমি ষণ্ডদের মাফ করে দিই। এবং সেই সময়ে শিল্পী মন্তব্য করে -- আমার কী সুন্দর জাপানি ওয়াটার প্রুফ ছিল, সেটা পরলে এই গোবরজলে চান করতে হত না -- ছিঃ। তবে ভাগ্যি ভাল, বমিটা সে আর করেনি।

বোধগয়ায় পৌঁছে প্রথমেই চলে যাই একটি গেস্ট হাউজে। যত শিগগির সম্ভব বাথরুম। চান-টান করে সবাই বেরোলুম। প্রথম যেতে দেওয়া হল স্বভাবতই দুই সিক্তবসনাকে। তাঁরা এসে বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়ে হু হু করে কাঁপতে লাগলেন। আমি আরেক ডোজ রাসটাক্স দিয়ে চানে ঢুকলুম।

আমাদের সকলেরই হাড় ঠকঠক, পা কন কন। ব্যথা মরাতে দেখি মালবিকা-মা হঠাৎ পেন্টুল পরে যোগাসন করতে লেগে গেল। সুমিতার দাওয়াই অন্যরকম। সে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর বেশ কিছু আপেল আর কমলালেবু নিয়ে ঘরে ঢুকল। আমাদের প্রত্যেকের দিকে একটা করে ছুঁড়ে দিল। কাজল ছাড়া সব্বাই ধরতে পারল। শিল্পী কম্বলের মধ্যে থেকে বলে উঠল লোপ্পা ক্যাচ কাজলাদি ধরতে পারলে না ! আমি তো রঞ্জুদিকেই সবচেয়ে ন্যাতাজোবড়া ভাবতুম।

এইসব বিশেষণ আমার দিকে প্রায়ই ধেয়ে আসে, আমি কান দিই না। ভাগে একটি চমৎকার কমলালেবু পড়েছিল, মন দিয়ে সেটা খেতে থাকি। শিল্পী দেখল ওর তিরটি ফসকে গেছে। বললে -- কী রঞ্জুদি, রা কাড়লে না যে ?

আমি বলি -- সত্যিকারের ন্যাতাজোবড়া যে কে সেটা পথে - গেস্ট হাউজে -- এভরি ওয়ান ক্যান সি। কুড সি। জোবড়া এবং ন্যাতা।

শিল্পী রণে ভঙ্গ দিয়ে কম্বলে মুখ লুকোল। অর্ধ সর্বাঙ্গাসন অবস্থায় মালবিকাদি নিচু মুণ্ড থেকে বলে উঠল -- ভাগ্যে লেখিকা। -- ধপাস করে শয়ান হল, তারপর যোগ করল -- সঙ্গে ছিল !

বোধগয়ার কথা আর কী বলব। অপূর্ব। চমৎকার। এক একটা প্যাগোডা দেখি, আর স্তব্ধ হয়ে যাই। যেমন স্থাপত্য তেমনই আবহাওয়া।

এই হল সেই বিখ্যাত উরুবিল্ব গ্রাম যার নৈরঞ্জনা নদী তীরে বুদ্ধদেবের সিদ্ধি, সুজাতার পায়েস-ভক্ষণ। তবে কেন জানি না সেই প্রাচীন উরুবিল্ব প্রাচীন বুদ্ধদেব প্রাচীন ভারতবর্ষ কিছুই ঠিক অনুভব হচ্ছিল না। এ যেন একটা আধুনিক মন্দির শহর। আন্তর্জাতিক, সুচারু খুব, এখানকার বুদ্ধদেব একেবারে দেবতা, কমপ্লিট দেবতা, কতটা তিনি নিজে আর কতটা ভ্রাম্যমাণ পরিবর্তিত বৌদ্ধধর্ম দ্বারা সৃষ্ট -- বোঝা যাচ্ছিল না।

কথাটা বলতে মালবিকাদি বলল, নে নে আর বক্তিমে করিস নে। ভুলে যা তুই লিখিস।

-- যা বাব্বা।

ওদিক থেকে শিল্পী বলল, আসলে রঞ্জুদি তুমি তো ব্যাঙ্কক-ট্যাঙ্কক যাওনি ! এমারেল্ড বুদ্ধ-টুদ্ধ দেখোনি, হরিদ্বার আর কালিঘাট এই তোমার লিমিট। বৌদ্ধরা একটু অন্যরকম।

আসল কথাটা এদের বোঝানো আমার মায়ের কম্মো নয়। সুমিতা আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ছলে বলল -- বালখিল্য সব রঞ্জুদি, নিজ গুণে মাফ করে দাও।

বোধিবৃক্ষ দেখে স্থাণু হয়ে থাকি। এই অশ্বত্থ গাছের নিচে এক সময়ে বুদ্ধ বসেছিলেন ? অবশ্য এ বৃক্ষ মরে যাওয়ার পরে অনুরাধাপুর থেকে এরই চারার চারা এনে এখানে পোঁতা হয়। বিশাল বিশাল দুটি পা পাথরে খোদিত। শিল্পী আমার কানে কানে বলল -- বুদ্ধ নিশ্চয়ই দৈত্য ছিলেন না।

অশোকের সময়ে তৈরি মহাবোধি মন্দিরটির উল্লেখ নাকি হিউয়েন সাং-এর বিবরণীতে আছে। ১৮৮৯ সালে জেনারেল কানিংহাম মন্দির আমূল সংস্কার করেন। সম্প্রতি আবার সংস্কার হয়েছে। সুজাতা দিঘি দেখলুম -- এখানেই নাকি সুজাতা পায়েস নিবেদন করেন গৌতমকে। নদীতীরে ঝোপজঙ্গলে ভরা একটা স্তূপ। সেটাই নাকি সুজাতার বাড়ি। আরও দূরে মুচলিন্ড সরোবর। মুচলিন্ড সাপ বুদ্ধর ওপর ফণা ধরে ঝড়জল থেকে তাঁকে রক্ষা করত। অনিমেষলোচন চৈত্য -- কী সুন্দর নামটা। আমি শিল্পীকে বলি তোর যদি একটা ছেলে হয় তো তার নাম দিস অনিমেষলোচন -- দারুণ হবে।

শিল্পী বলল -- সুমিতাদির হলে তার নাম দেবে মুচলিন্ড।

মালবিকাদি বলল -- ফাজলামি-টামি বন্ধ রাখো তোমরা। এটা দেবস্থান।

তিব্বতি মনাস্ট্রিতে গিয়ে ২০০ কুইন্টাল ওজনের পেতলের ধর্মচক্র বাঁ থেকে ডাইনে তিনবার ঘুরিয়ে আমরা পাপের বোঝা হালকা করি। সুমিতা বাদে। সে বলে -- আমি কোনও পাপ-টাপ করিনি কখনও।

-- আহা, অজ্ঞাতসারে ধর পিঁপড়ে, মশা, মাছিও তো মেরেছিস।

-- সে ক্ষেত্রে আমার পাপ হয়ে থাকলে পিঁপড়ে, মশা, মাছিদের ডবল পাপ। ইন এনি কেস আই ডোন্ট বিলিভ ইন পাপ !

এ বিষয়ে আর না এগোনোই ভাল। পুরো ফ্রয়েডটি উজাড় করে দেবেন উনি। সাইকলজির লোক তো !

বাড়ি এসে, মানে গেস্ট হাউসে এসে শিল্পী বলল -- টু মেনি 'নাকি'জ।

-- মানে ?

-- এইখানে নাকি বুদ্ধ বুদ্ধ হওয়ার পর পা রেখেছিলেন। এই সরোবরের ধারে নাকি তিনি সুজাতার পায়েস খেয়েছিলেন, এই সরোবর থেকে নাকি মুচলিন্ড সাপ তাঁর মাথায় ফণা ধরেছিল। তা ছাড়া সাপের ফণা, ঝড়জলে ছাতার কাজ করতেই পারে না। রঞ্জুদি আমার সংশয় দূর কর।

আমি বলি -- অবিশ্বাসিনীদের বিশ্বাস উৎপাদন করা আমার কাজ নয়। তার জন্য পান্ডারা থাকে। এখানে দেখছি না। তবে গাইড তো ছিল। আর আমাকে বারবার বক্তিমে করতে বারণ করা হয়েছে নানান কোয়ার্টার্স থেকে। এখন আবার উল্টো পুরাণ কেন ?

সুমিতা বলল, টেক কেয়ার শিল্পী। অবিশ্বাসিনী মানে কিন্তু অন্য। নবকুমার কপাল কুণ্ডলাকে অবিশ্বাসিনী ভাবিয়াছিল। অতএব মৃত্যুদণ্ড।

-- তো তো বঙ্কিমি মানে। আমি আত্মরক্ষা করি।

-- বেশ এখনকার মানেটা কার নামে চলবে ? রঞ্জনা গড়াই ?

-- চলুক, আমার আপত্তি নেই -- আমি ভারি খুশি। -- তবে জানিস সুমিতা, তুই ফ্রয়েড জানলেও ব্যাকরণ জানিস না। আমার অর্থকরণে কোনও ভুল নেই।

চিনা, থাই, জাপানি, বার্মিজ, তিব্বতি, প্যাগোডাগুলো দুদিন ধরে আমাদের দেখা হল। দেখে আমি তো মুগ্ধ। সেই একই প্যাগোডা, তার ভেতরেই কত সূক্ষ্ম তফাত। কী অপূর্ব স্থাপত্য। আর একটা জিনিস -- চিনেরা বুদ্ধকে চিনে করে নিয়েছে। বার্মিজরা বার্মিজ, থাইরা থাই। কিন্তু ধরুন আমরা যখন খ্রিস্টকে আঁকি তখন তো তাঁকে ভারতীয় বলে আঁকি না। সেই সেমিটিক চেহারা। স্বর্গীয় করুণা উদ্রেককারী মুখ, তা ঐতিহাসিক সত্য হোক বা না হোক ! আমার কেমন একটা গর্ব হল আমরা সব ধরনের মুখ আঁকতে পারি। ইউরোপীয়, ভারতীয়, মধ্য প্রাচ্য, দূর প্রাচ্য যেখানে যত টাইপ আছে সবই আঁকতে পারি আমরা। কিন্তু কোনও ইউরোপীয় শিল্পী কি সেভাবে পেরেছেন ! গগ্যাঁ অবশ্য তাহিতিয়দের এঁকেছিলেন। কিন্তু ওরা কি আমাদের কৃষ্ণ বা রাধাকে কখনও আঁকতে পেরেছে ? নাকি চেষ্টাই করেনি। যদি না করে থাকে, তো কেন ?

এইসব ভাবছিলুম মালবিকাদি-মা বাজখাঁই গলায় বাণী দিলেন -- যাক, বুদ্ধ যে মোঙ্গোলীয় ছিলেন একেবারে হাতে-কলমে প্রমাণ হয়ে গেল।

ভীষণ প্রতিবাদ করে উঠি আমরা বাকি তিনজন -- মানে ? বুদ্ধ আমাদের। বুদ্ধকে আমরা কিছুতেই ছড়ব না।

-- আরে বাবা, নেপালি তো ! -- মালবিকাদি মা বলেন। কপিলবস্তু তো নেপালে। মোঙ্গোলীয় বলে আমি ভুল করেছি ? ভুটানি, নেপালি, চিনে, তিব্বতি সব মোঙ্গোলীয়।

-- কিন্তু আজকের নেপাল আড়াই বছর আগেও সেই নেপালই ছিল নাকি ? আমরা বুদ্ধর যেসব মূর্তি পাই তার কোথাও মোঙ্গোলীয়ত্ব নেই।

সুমিতা চিন্তিত গলায় বলল -- খাসি -- গারো -- নাগা ... এমনকি আসাম, মণিপুর ... অরুণাচল প্রদেশ।

-- কী বলতে চাও ? শিল্পী উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করে। গৌতম বুদ্ধ, দা গ্রেট লাইট অব এশিয়া তাঁকে কেড়ে নিচ্ছ ? নাও নাও। কৃষ্ণকেও আফ্রিকান করে দাও না, রাধা

না হয় ইজিপশিয়ান, বিবেকানন্দর অত বড় বড় চোখ, চৌকো চোয়াল, নির্ঘাৎ গ্রিক, রামমোহন রায় পাঠান, হাতে রইল বিদ্যাসাগর, সুভাষ বসু আর রবীন্দ্রনাথ।

সুমিতা ভাবিত গলায় বলল, রবীন্দ্রনাথ ছ ফুট দু ইঞ্চি লম্বা ছিলেন। ভারতীয় হয় তো কিন্তু বাঙালি কি না ভাবতে হবে। দি সেম ইজ ট্রু অ্যাবাউট সত্যজিৎ রায়।

-- রবীন্দ্রনাথ, সত্যজিৎ রায়কেও কেড়ে নেবে ? রাগে, কান্নায় গরগর করছে শিল্পী -- সুভাষ বসুকেও ইটালিয়ান বানিয়ে দাও না তাহলে। মিল আছে, বেশ মিল আছে।

-- শ্রী অরবিন্দ তো ফ্রাঞ্চাইজড। এতক্ষণে কাজলা বলে।

গলা মিলিয়ে এতক্ষণে একটু হাসি আমরা। কাজলার গর্ব গর্ব মুখের ভাব কেমন দিলুম একখানা -- জাতীয়।

আমি বলি -- দ্যাখো আমরা অ্যানথ্রপোলজি তেমন জানি না। তবে নানারকম অস্ট্রোলয়েড, মঙ্গোলয়েড, কাকেশীয়ান, নিগ্রয়েড মিলেমিশে আমরা হয়েছি বাবা। আমাদের মধ্যে ডাচ রক্ত, পর্তুগিজ গ্রিক রক্ত, শক-হুন রক্ত, কাকোশিয় মঙ্গোলীয় সব রকমই মিশেছে। সে অর্থে ইন্ডিয়া ইজ দা গ্রেটেস্ট মেল্টিং পট, নট অ্যামেরিকা।

এভাবেই আমাদের সেদিনের তর্কসভা শেষ হয়। জাপানি মন্দিরের বাগানে -- ধবধবে সাদা মহাকায় দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তির কাছে সন্ধেবেলা অনেক অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি আমরা। এঁর মুখ, যদিও অনেক নিচ থেকে দেখা। কিন্তু তেমন জাপানি নয়। আমাদের চেনা তথাগত বুদ্ধকে দেখে আমাদের সংক্ষুব্ধ মন ভরে যায়।

পরদিন সকালেই রাজগীর যাত্রা।

(৭)

ঘুরিতে ঘুরিতে মাথা বনবন ঘোরে
ভার হৈল দেহমন ঘুরিয়া বেঘোরে।

শ্রীমতী সুমিতা সরকারের ট্যুরিস্ট সাইকলজি সম্পর্কে এমন অভ্রান্ত জ্ঞান যে তিনি কোথাও বুকিং করেননি। তাঁর ধারণা ঝাড়খন্ড বিহার গন্ডগোলের পর থেকে রাজগীর আর ট্যুরিস্ট লোভন নেই। ভুল। একেবারে ডাহা ভুল। হোটেল অজাতশত্রু, হোটেল মগধ, হোটেল বিম্বিসার, এবং আরও অজস্র অজস্র ... হয় জায়গা পেলুম না। নয় জায়গাটা নেওয়ার মতো নয়। যেমন একটি দারুণ স্মার্ট চেহারার হোটেলে, তার স্মার্টতর ম্যানেজার স্মার্টতম হাসি হেসে বললেন -- অব কোর্স, ঠিক আপনাদের জন্যই ডি-ফোর ঘরটি অপেক্ষা করছে ম্যাডামরা। চারজনের কিন্তু পাঁচজনে অনায়াসে কুলিয়ে যাবে।

-- গিজার ?

-- খারাপ হয়ে গেছে। চার বালতি করে হট ওয়াটার দু-বেলা পাঠিয়ে দেব।

-- বেড টি ?

-- শিওর। দার্জিলিং অর্থোডক্স।

-- তাই ? সুমিতা চা বিশেষজ্ঞ চোখ বড় বড় করে বলল -- বাঙালিরা ছাড়া আর কেউ তো দার্জিলিং খেতে জানে না দাদা।

মিষ্টি হেসে ভদ্রলোক বললেন -- ঠিকই। কিন্তু আপনিও বাঙালি, আমিও বাঙালি নয় কী ?

খাবার ?

-- স্পেশাল কিছু চাইলে একটু আগে থেকে অর্ডারটা দেবেন। নইলে বাঙালি খানা, ডাল ভাত, মাছের ঝোল, পোস্তর বড়া, বেগুনি, অম্বল, চাটনি কিংবা চিকেন, কিংবা মাটন যা চান। থালি সিস্টেম। মাছ ভাত পঞ্চাশ টাকা, চিকেন ভাত ষাট টাকা, মাটন ভাত সত্তর টাকা। তাছাড়া চাইনিজ, থাই, কন্টিনেন্টাল -- জাস্ট সকালে বাজার করার আগে জানিয়ে দেবেন।

ঘর দেখতে যাই। একটি লম্বা ঘর। চুন খসে এসেছে। জায়গায় জায়গায় তাপ্পি। তার ওপরই চুন মারা হয়েছে। এবং ঘর জোড়া বোধহয় চারখানা তক্তপোষ। এধার থেকে ওধার নিশ্ছিদ্র করে পাতা, তার ওপর আধময়লা বিছানা।

শিল্পী তড়াক করে বেরিয়ে এসে নাকে রুমাল দিল।

ম্যানেজার বললেন -- অ্যাটাচড বাথ থরোলি পরিস্কার করিয়ে দিচ্ছি, বিছানা পাল্টে ঝকঝকে ...

ততক্ষণে আমরা সবাই রাস্তায়। এতক্ষণে মালবিকাদিকে সত্যি চিন্তিত দেখাল। বলল -- তুই যে এত দায়িত্বজ্ঞানহীন সুমিতা আমার জানা ছিল না। শিল্পীর নাকের রুমাল সরেনি। কাজলা বলল -- আমি আর ঘুরতে পারছি না। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

আমি বললুম -- এই টাঙ্গাবালা ! ইধর সরকার কি কোই বাংলা উংলা নেই হ্যায় ক্যা ?

টাঙ্গাবালা বলল -- জরুর। আইয়ে দিদিলোগ। উও তো বহোৎ উমদা বাংলা। রূপেয়া বহোৎ লাগে গা।

বিনা বাক্যব্যয়ে আমি টঙ্গায় উঠে বসি। অন্যরা আমাকে অনুসরণ করে।

রাজগীর খুব বড় শহর নয়। তবু তারই একেবারে শেষ প্রান্তে বিরাট গেট, দারোয়ান ও চমৎকার বাগান দেখা দিল। পেছনে, মানে পাশের দিকে জব্বর একখানি বাংলো।

লোক নেই, জন নেই। অনেক খুঁজে পেতে কাউন্টারে ঘুমন্ত ম্যানেজারকে পাওয়া গেল। দোতলায় দুখানি এসি ঘর আছে। আমরা নিতে পারি। আ ...হ্। সরকারি বাংলো, বাগান। দোতলা, এসি রুম। কিছুক্ষণ সময় নিলেন ভদ্রলোক। ঘুমন্ত পরিচারকদের ডেকে-ডুকে ঝাড়াঝাড়ি করতে পাঠালেন। নিজেও বারবার যাওয়া-আসা করলেন।

মালবিকাদি সান্যাল উবাচ -- ম্যানেজারসাব আপকো নিদ টুট গিয়া ক্যা ?

-- হাঁ হাঁ, উও বাত ...

-- নহী। কুছ সপ্‌নো-টপ্‌নো দিখাতা নহি তো ?

-- আরে, ম্যাডাম, -- ভদ্রলোক হাত কচলিয়ে অস্থির।

-- ঔর গেস্টস নেহি হ্যায় ক্যা ?

-- জরুর জরুর হ্যায়। দো জর্মন কাপল। তিনোঁ জাপানিজ লোগ, দো চাইনিজ হ্যায়। হল্যান্ড সেভি আয়েগা।

-- বাস ?

ম্যানেজার মাথা চুলকোয়। ইয়ে সব রুম রিপেয়ার হুয়া ম্যাডাম। সিজনমে গেস্টস আতা হ্যায় জরুর, লেকেন ... সরকার কি বাত। প্রফিট নহি আনে সে রিপেয়ার হোনে কা ...

বুঝলুম। তা আমাদের ঘর দুটি রিপেয়ার করা তো ?

-- জরুর জরুর। ঘাবড়াইয়ে মৎ ম্যাডাম। উও দোনো ফার্স্ট ক্লাস রুম। দেখিয়ে না।

চমৎকার চওড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠি। বাঁ দিকে মোড় নিই। চওড়া বারান্দার কোলে দুটি ঘরের লক খোলে। রেড কার্পেট ওয়েলকাম। ঘরজোড়া। চমৎকার ডাব্‌ল বেড। বসবার দুটো সোফা টেবিল। জানলার পাশে বসে দৃশ্য দেখা যায়। বাথরুম দেখে এলুম। রীতিমতো বড় সাইজ। সব পরিষ্কার। ডাবলু সি দিয়ে জল পড়ছে। গিজার চালু করে দিতেই লাল আলো জ্বলে উঠল। জল গরম হচ্ছে। জানলা খুলে দিলেন ভদ্রলোক। ভারি ভেলভেটের পার্দা খুললে বিস্তৃত জানলায় নেটের পর্দা। তার পেছনে জাল। বাইরে বাগান। আলোর সুইচ, এসির নব, কলিং বেল-এর সুইচ টিভির রিমোট সব ঠিক করে দিয়ে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

ধপাস করে আমরা পাঁচ বেডের ওপর বসে পড়ি। শিল্পী বসতে পেয়েই শুতে চায়। কাজলাও নীরবে তার পাশে। বুক কাঁপানো দীর্ঘশ্বাস ফেলে মালবিকাদি বলল -- ভাগ্যে লেখিকা সঙ্গে ছিল।

তুমুল আরামের স্নান পর্বের পর আমরা বাজার টিপি। আদি অকৃত্রিম ম্যানেজার এসে দেখা দ্যান। -- বাতাইয়ে জী !

-- আজ হাম সব রুম মেই লাঞ্চ করুঙ্গি।

-- রুম সার্ভিস তো নহি হ্যায় ম্যাডাম। ম্যানেজার মাথা চুলকোয়। জানলা দিয়ে দেখায় -- সুদূরে একটি চমৎকার কাচ ঘর। ডাইনিং রুম।

-- চায় মিলেগি তো সুবাহ সুবাহ ?

-- নেই ম্যাডাম, বেড টিকে লিয়ে তো কুছ ...

-- দেনে পড়েগা ? এক্সট্রা ?

-- নেই, নেই। আদমিই নেহি হ্যায়।

পাঁচজনে পাঁচজনের মুখে দেখি। খিদেয় পেট খলবল করছে। অতএব ক্লান্তি হজম করে সেই সুদূর কাচ ঘরের দিকেই যাত্রা করি।

চমৎকার ঘরখানি। একটি টেবিল ঘিরে পাঁচজনে বসি।

-- কোই হ্যায় ?

আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে একটি লোক বেরিয়ে আসে।

-- খানা। খানা।

শিল্পী প্রায় ভেংচে ওঠে। খিদে পেলে ওর মাথার ঠিক থাকে না।

মালবিকাদি সবিনয়ে জিজ্ঞেস করে -- কী মিলবে ?

ঘোমটার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে -- রোটি। আলু কি সবজি।

-- ডাল অব্দি দেবে না ? শিল্পীর ঠোঁট ফুলছে।

-- হ্যায়।

-- তো লাও। হম পাঁচকে লিয়ে -- সুমিতার এতক্ষণে কর্তৃত্বব্যঞ্জক গলা বেরিয়েছে। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় এক ঘন্টা পাঁচ মিনিট পর খাবার এল। রুটি, আলু হলুদ গোলা, ও অড়হর ডাল। খেতে খেতে কাজলা বলল, যাক আমি ভালই রাঁধি।

জিজ্ঞেস করে জানা গেল। গেস্টরা নাকি সকাল হতেই বেরিয়ে যান। দশটার আগে ডাইনিং রুম খোলেই না। রাত কো কোই কোই আ জাতা।

রুটি গুলো ভাল। ডাল এদের ভালোই বানাবার কথা। কিন্তু স্টকে বোধহয় কিছু ছিল না। জলের মধ্যে কিছু অড়হরকে সাঁতার খেলতে দেখা গেল।

খেয়ে-টেয়ে মালবিকাদি বলল -- দ্যাখ মাতাজী সেজে আমার যা টেনশন গেছে, নরম বিছানা, আর লাল কার্পেট আমায় বড্ড ডাকাডাকি করছে। আমারও তো মাথায় এদিকে প্লট এসে গেছে। আমিও মালবিকাদির পথ অনুসরণ করি। শিল্পী আর সুমিতা বেরিয়ে যায়। কাজলা অন্য বেডরুমের দিকে হাই তুলতে তুলতে যাত্রা করে।

মালবিকাদি এইসা নাক ডাকতে লাগল যে আমার লেখা কিছুক্ষণ পরেই ডকে উঠল অবশ্য। দেখলুম -- ডায়েরিতে লিখেছি -- ঘঁড়ড় ঘাঁই, ফঁড়র ফাঁই, ফুস্স্স্স্।ঘ্র্যাঁ ঘ্র্যাঁ - অ্যা ঘ্র্যাঁৎ। গুরুরুরু গুরুরুরু ঘুৎ। একবিন্দু বাড়িয়ে বলছি না। একেবারে পরিস্কার অক্ষরীভূত করে ফেলেছি মালবিকাদির নাসিকা-ধ্বনিকে। এ যেন একটা আলাদা ভাষা। শরীরের ভেতরের নিরুদ্ধ বায়ু, ল্যারিংসের মধ্যে দিয়ে মেসেজ পাঠাচ্ছে। আহ্ কী আরাম, কী আরামম্ম্ বড়ই ...। খবরদার কেউ ঘুম ভাঙাবে না, চেষ্টাও করো না। চমৎকার লাগছে বেশ, চমৎ ...।

শেষ পর্যন্ত উঠে পড়লুম। সোনালি রঙের সিল্ক পরে চমৎকার একটা হলুদ কার্ডিগান আর কালো শাল গায়ে দিয়ে সেজেগুজে বেরিয়ে পড়লুম। মালবিকাদি ... বিকেল হয়ে গেছে। আমি বেড়াতে যচ্ছি কিন্তু। মালবিকাদি ও মালবিকাদি-ই-ই।

উত্তর এল -- ঘোঁৎ। কাজলার দরজাও বন্ধ।

নেমে বাগানে বেড়াতে থাকি। চমৎকার সব ফুল ফুটেছে। যত সন্ধে হয় কামিনীর গন্ধ মাতাল করে দেয় স্নায়ুদের। কিন্তু জার্মান-ডাচ-জাপ কাউকেই দেখতে পেলুম না। পশ্চিমী ট্যুরিস্টরা পারেও বাবা। কোন সকালে বেড টি শুদ্ধু না খেয়ে বেরিয়ে গেছে। সন্ধে হয়ে গেল। শীত জাঁকিয়ে পড়ছে। আসবার নামটি নেই। এলে দু-চারটে কথাবার্তা বলতে পারতুম। কী করি, সেই অদ্ভুত ম্যানেজারের সঙ্গেই কথা বলি।

-- বাজার করা হয়েছে -- জিজ্ঞেস করি।

-- মার্কেটিং ? কিঁউ ?

-- আরে বাবা, হাম সব গেস্ট কো লিয়ে খানা বনানা হ্যায় না ? ড়হর কি ডাল, রোটি কি আট্টা, কুছ কুছ ভেজিটেবলস, মছলি, মাটন ...

-- ইয়ে ভেজ হ্যায় -- জবাব এল।

বেশ বাবা ভেজই দে। বলি আপকি ডাল খতম হো গিয়া লাগতা। শাক ভি কুছ নহি হ্যায়। আপকা সব জার্মান, জাপানিজ, ইন্ডিয়ান গেস্ট কো তো খানা লাগেগা ?

খুব বোদ্ধার মতো ঘাড় নাড়ল।

পেছন থেকে ঘাড়ে টোকা পড়ল। সুমিতা। -- কী ব্যাপার হিন্দি ক্লাসে ভর্তি হলে ?

-- তোমরা সারা দুপুর ধরে কোন ক্লাস করে এলে শুনি ? সুমিতার পেছনেই শিল্পী। দুজনেরই কাঁধ থেকে হাত থেকে থলি ঝুলছে।

-- পারিসও বাবা তোরা। রাজগীরেও মার্কেটিং ?

রহস্যময় হাসি হেসে দুজনে বললে -- চলো ওপরে। জবর মার্কেটিং হয়েছে।

ওরা তিনজনে এক ঘরে। কাজলার ঘরে নক করি, কেউ খোলে না। অনেক ডাকাডাকির পর খুলে দিল। চোখ-মুখ ফোলা।

-- কীরে গঙ্গাবাবুর জন্যে মন কেমন করছে ? কেঁদেছিস মনে হচ্ছে ?

-- তোর মুণ্ডু।

-- খুব ঘুমিয়েছিস দেখছি।

-- তেমন আর কই ! আনপ্যাক করেছি সব। এবার সেজেগুজে বেরবো। আমরা তো হেসেই বাঁচি না।

-- এই রাতের অন্ধকারে বেড়াতে বেরবি ? রাজগীরের রাস্তাঘাটে আলোরাও এবার ঘুমিয়ে পড়ছে।

শিল্পী-সুমিতা আস্তে আস্তে তাদের সামান বা মার্কেটিং খোলে। একটি হট প্লেট, দশখানা ডিম, এক পাউন্ড বিচ্ছিরি দেখতে পাঁউরুটি। কলা, কমলালেবু, শাঁকালু, মাখন। অ্যালুমিনিয়ামের একটা সস প্যান, একটা ৫০০ গ্রামের দুধের প্যাকেট। বিস্কুটের প্যাকেট দু-তিন রকম।

কাজল বলল -- তুমি যাও বঙ্গে, উনুন যায় সঙ্গে। সব তো আনলি। শক্কর ? নিমক ? মরিচ ?

থলি চাপড়ে সুমিতা বলল - হ্যায়, হ্যায়, স্টকমেই হ্যায়।

শিল্পী বলল -- সক্কালবেলা বেড টি। সুমিতাদি দেবে, সঙ্গে খাস্তা নিমকি বিস্কুট।

সুমিতা বলল -- আট সাড়ে আটে ব্রেকফাস্ট। পাঁউরুটি টোস্ট, ডিমসেদ্ধ চা করবে কাজলাদি, ডিস্ট্রিবিউশন উইথ কলা শিল্পী।

-- বা বা বা বা -- কাজলা একেবারে নেচে উঠল। টোস্ট, ডিমসেদ্ধ, চা ... আর কিছু না ?

-- যাই বলো কাজলদি তুমি খুব প্যাসিভ রোল প্লে করছ। একটু হাত-পা নাড়ো।

-- একেই বলে শীতে আমার হাত-পা আসছে না। কাজল চাদর আরেকটু মুড়ি দিয়ে বসল। -- কেন ? তোদের লেখিকাকে বাদ দিচ্ছিস কেন ?

-- বাদ দিইনি তো -- সুমিতা বলল -- ধোয়া পাকলা করতে হবে না ? সেগুলো রঞ্জুদি করবে। আমি হিসেব করে নিই। প্লেট, কাগজের কাপ, প্লাস্টিকের গ্লাস। কেউ বলেনি। কিন্তু আমি গুছিয়ে এনেছি। হাতে রইল সসপ্যান। গিজারে তো গরম জল পাবই, গরমাগরম ধুয়ে নেব। -- রা কাড়ি না সুতরাং।

কাজলা সোৎসাহে বলে -- তাহলে করব, তাহলে করব। কিন্তু কম্যান্ডার ? সে কী করবে ?

-- কম্যান্ড করবে। আবার কি ? পেছনে যে ঘুমতাজা মালবিকাদি এসে দাঁড়িয়েছে আমরা কেউই খেয়াল করিনি।

খুব আড্ডা জমে অতএব। কাজলা গান ধরে -- শ্যামা মা কি আমার কালো রে। শিল্পী তার সঙ্গে ক্রিয়েটিভ ডান্স করে। সুমিতা টেবিলের ওপর তবলা বাজায়। এবং মালবিকাদি জোকস বলে আমাদের হাসিয়ে হাসিয়ে পেট ফাটিয়ে দেয়। জোক নং এক -- কাজলরেখা মিত্তির আর শিল্পী বরাট নায়গ্রা জলপ্রপাত দেখতে গেছে। অত বড় প্রপাতটা ধধ্ধড় করে পড়ছে, কেউ কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছে না। সাহেব মেমসাহেবরা ভাবছে একি অলৌকিক কান্ড রে বাবা ! আলোচনা শুনে শিল্পী বরাট বলল -- এই যে দেখছেন সিল্ক টাঙ্গাইল পরা বাঙালি বধূটি। এঁকে একটু চুপ করতে বলুন। আর কাজলরেখা বলল -- এই যে দেখছেন পেন্টুল পরা পার্পেন্ডিকুলারটি এঁকে একটু চুপ করতে বলুন শব্দ ঠিক শোনা যাবে। দুই মেমসাহেব দুই মক্কেলের মুখ চেপে ধরল, অমনই নায়গ্রার গর্জন শোনা যেতে লাগল।

জোক নং দুই -- সুমিতার ব্লাড প্রেশার বেড়েছে, রঞ্জুর হার্ট, ডাক্তার দুজনকেই ওষুধ-টষুধ দিয়ে বলেছেন সিঁড়ি ওঠানামাটা কিছুদিন একদম বন্ধ করুন। হপ্তাখানেক পরে দুজনে বিমর্ষ মুখে ডাক্তারের কাছে গেছে। ডাক্তার বললেন -- কী হল ? এখনও কমেনি ? মাথা চুলকে রঞ্জনা গড়াই বলল আর কদিন জলের পাইপ বেয়ে ওঠানামা করব ডাক্তারবাবু ? হাত পা ছিঁড়ে কী হয়েছে দেখুন ? সুমিতা সরকার বলল -- আমারও এক অবস্থা, জানলার লিনটেল বেয়ে বেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ওপর-নিচ করছি। দয়া করে সিঁড়িটা অ্যালাও করুন এবার।

তখন আমিই বা বাদ থাকি কেন, আমিও তিন নম্বর জোক বলি -- এক পাঞ্জাবি কবি মেয়ের বিয়ে হয়েছে। বর তো পড়েছে মহা ফ্যাসাদে। বন্ধুদের বলছে ঘুংঘট খুলে কবি-বউকে কী বলব রে ? বন্ধুরা উপদেশ দিল, এই বলবি -- তাই বলবি ... । বর মহা খুশি। বউ তো ফুলশয্যার খাটে চিবুক অব্দি চুমকি ওড়নায় মুখে ঢেকে বসে আছে। বর পা টিপে টিপে গিয়ে নার্ভাস হয়ে ঘুংঘটটি খুলে ফেলে বলল -- তুমিই আমার কবিতা, তুমিই আমার চাঁদনি, তুমিই আমার গুলবদন ... বউ কিছুক্ষণ থমকে বরের মুখখানা দেখে নিল। তারপর বলল -- তুমিই আমার রাজেশ, আমার রাকেশ, আমার মন প্রীত, আমার গুর্বচন।

হেসে-টেসে গা গরম করে আমরা কাচঘরে রওনা দিই। রোটি, হলুদ-গোলা আলু, ড়হর ডাল জলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ দেখি কাজলা কোমরে আঁচল গুঁজছে। কী করছিস। কী করছিস বলতে না বলতেই -- কাজল মারমুখো হয়ে ঘোমটা পরা পাচক ঠাকুরের কাছে গিয়ে হাজির।

-- কুছি ভি পাকানে নেই আতা তুমকো ? ফুলগোবি, মট্টর, নেই ক্যা ? ডাল কা ডিব্বা লাও। কেৎনা লাগে গা সব দিখাউঙ্গি হম।

লোকটা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে বলল -- পৈসা নেই মিলা জী।

তখন আমরা তাকে সমবেত চাঁদায় তুষ্ট করি। ভাল করে বোঝাই। কাল রাতে গোবি আনবে, আলু, মটর, ধনিয়া পাতা, বুট কি ডাল আনবে। ডুমো ডুমো করে সবজি কেটে নিমক দিয়ে সেদ্ধ করে তাতে ধনেপাতা ছড়িয়ে দেবে। এই কালকের মেনু, আর এই তার রেসিপি।

তারপরে কুইক মার্চ করে আমরা ঘরে ঢুকি, আস্তে আস্তে গল্প করতে করতে বিছানাজাত হয়ে ঘুমের দেশে যাত্রা করি।

(৮)

আড়াই হাজার বছর আগে যে পথ দিয়ে গৌতম বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র হাতে হাঁটতেন, রোমাঞ্চিত হয়ে সেই পথ ধরে চলেছি। পাশ দিয়ে শ্রেষ্ঠীর পাঁচ ঘোড়ার রথ চলে গেল। অশ্বারোহী চলে গেল কজন। একটি ভবনের দ্বারে বুদ্ধ দাঁড়িয়েছেন। একটি মহিলা এসে পাত্রে ভাত আর গোমাংস ঢেলে দিল। আমরাও চলেছি। আমি মঞ্জুশ্রী, সুমিতা মধুমালিকা, শিল্পী অনুসূয়া, মালবিকাদি মালবিকা, কাজলরেখা কম্বালিকা আমরা সব বেণুবনে চলেছি বুদ্ধের উপদেশ বা দেশনা শুনতে। পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে সাতটা সাদা ঘোড়ার রথ চলে গেল।

কে গেল সখি ? কজ্জলিকা জিজ্ঞেস করল।

আমি মঞ্জুশ্রী সসম্ভ্রমে বললুম -- মহারাজ বিম্বিসার।

-- কী বকছিস রে ? কাজল বলল, বিড়বিড় করছিস যে ? কবিতা মনে এল নাকি ?

আমি বলি -- এই যে ডান দিকে লম্বা পাহাড় দেখছো এর নাম -- বৈভার। এখানে আছে হটস্প্রিং। চান করে বাতের ব্যথা সারিয়ে নিতে পারো। আছে জরাসন্ধ কি বৈঠক। সেখানে নাকি ভীমে জরাসন্ধে কুস্তি হয়েছিল। আর বাঁ দিকে শৈলগিরি। এর হায়েস্ট পিক শকুনের ঠোঁটের মতো। তাই নাম গৃধ্রকূট। এখানে বহু ভিক্ষু সাধনা করে থের মহাথের হয়েছিলেন। এই পর্বতের চূড়া থেকে বুদ্ধ কারাগারে রাজা বিম্বিসারকে দেখা দিতেন।

-- সত্যি ?

-- ওই দ্যাখ সুমিতা, ওই ভাঙা ভাঙা রুইনসগুলোই অজাতশত্রুর কয়েদখানা। নিজের বাবাকে ব্যাটা না খাইয়ে মেরেছিল।

-- সেই অভিমানেই কি রাজগিরের ট্যুরিস্ট বাংলো আমাদের না খাইয়ে রাখছে ? মালবিকাদি হেঁড়ে গলায় বলল। আমরা কি অজাতশত্রুর বংশধর।

না। এরা কোনও জিনিসটা সিরিয়াসলি নেবে না। খালি হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা।

দুপুরে এক হোটেলে ঢুকে পেট পুরে মাছ-ভাত খাওয়া গেল। গলদা চিংড়ি দিয়েছিল। পোস্ত। কুমড়ো-বেগুনের অম্বল তেঁতুল দিয়ে। আহ্।

-- কি মালবিকা মা, দুঃখু গেল ? আমি মালবিকাদিকে জিজ্ঞেস করি। আর ঠিক সেই সময়ে উদয় হয় গোটা তিন-চার ছোকরা। অদূরে। এরাও খেতে এসেছে। জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেঁকে বেঁকে দাঁড়িয়ে। আবার একজন সিগারেট ফুঁকছে। ভাবছি প্রতিবাদ করব, হঠাৎ একজন বলে উঠল, আরে গ্‌গুরু এ সেই গুরুমার দল না ? দুন এক্সপ্রেসের কুপেতে সাধনভজন করছিল ? খাস্তা গজার পেসাদ দিচ্ছিল।

আর একজন বলল -- লম্বুটাকে দেখেই চিনতে পারলুম। সেই এক জিনস। ছাপ মারা টপ। আর একজন বলল -- আইস সাবাশ, ওই তো ওই তো গুরুমা রে ছাপকা ছাপকা শাড়ি পরে গলদা চিংড়ি সাঁটাচ্ছে। ব্ল্যাক বিউটি দিদি একই আছে। বাকি তিনটে ভোল পাল্টেছে। ফ্রড।

মুখ নিচু করে খেতে খেতে আমি বলি -- হল তো !

শিল্পী বলে -- 'লম্বুটা' -- 'সাঁটাচ্ছে' -- 'বাকি তিনটে" ছি্।

ধীরেসুস্থে খাওয়া শেষ করে মালবিকাদি গম্ভীরভাবে বলল, আমরা শুনতে পাইনি -- ঠিক আছে ?

মুখখানাকে হাঁড়ির মতো করে কমান্ডার-ইন-চিফ বেরোলেন। তাঁর আঁচল ধরে শিল্পী। আমি আর সুমিতা আজ শখ করে শাড়ি পরেছি। প্রায় হাত ধরাধরি করে পার হয়ে যাই। তারপরেই বুঝি -- কাজলা নেই।

প্রায় দরজার কাছে এসে পড়েছি। দেখি কাজলা তার কামরাঙা রঙের সিল্ক টাঙাইল কোমরে গুঁজে মারমুখো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

-- কী বললে ? আবার বলো।

-- খারাপ কিছু তো বলিনি দিদি। বলেছি ব্ল্যাক প্রিন্সেস। কমপ্লিমেন্ট।

-- তোমাদের বয়সী আমার ছেলে আছে তা জানো ? বাড়িতে মা-বোন নেই ? মা-মাসির সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে ? টুকলি করা ছেলে দেখলেই বোঝা যায়।

-- মুখ সামলে মাসিমা। কী করে জানলেন টুকলি করি ?

-- আমি মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রী -- টুকলি দেখলেই বুঝতে পারি। পাতা-ফাতা না খেয়ে একটু মন দিয়ে পড়াশোনা করো বুঝলে ?

আমরা ভয়ে ঠান্ডা হয়ে যাই। করছে কী কাজলাটা !

কিন্তু ছেলেগুলো কেমন মুষড়ে পড়েছে দেখা গেল।

কাজলা বলল -- আমার ভাসুর-ঠাকুর এক্সাইজ অফিসার। গন্ধ পাই, বুঝলে গন্ধ পাই। বেশি চালাকি করো না।

একজন বললে -- এই ছেড়ে দে ছেড়ে দে। যান মাসিমা যান। একখানা টেনে ঘুম দেবেন, রাগ ঠান্ডা হয়ে যাবে।

কাজল বলল -- আমি টেনে ঘুম দেবো কি তোমরা টেনে দৌড় দেবে ভেবে ঠিক কর। অপরাধ দমন শাখার ডি.জি আমার মেসোমশাই, বুঝলে ?

ধীরে সুস্থে ব্যাগ থেকে পানের ডিবে বার করল -- নাও, তিনজনে তিনটে পান খেয়ে নাও। মুখটা ফ্রেশ হয়ে যাবে।

তিনজনে হাত পেতে পান নেয়।

আমাদের দিকে আসতে আসতে কাজলা হেঁকে বলল -- খাওয়ার পরে খেও।

-- ফিরতে ফিরতে মালবিকাদি বলে -- একেই বলে প্রকৃত বীরাঙ্গনা।

কাজল আমাদের পান দেয়। যেন কিছুই হয়নি।

শিল্পী বলল, তোমার ভয় করল না কাজলদি ?

-- ভয় ? হাঃ হা। কাজলরেখা মিত্তির গোপাল-নেপাল অনেক মস্তান চরিয়েছে বাবা। ভয় ! ছোঃ !

যাক একটা ফাঁড়া কাটল। আমরা টাঙা চড়ে বাঁদিকের পাহাড়ে যাই। পাথরে পা রেখে রেখে চুড়োর দিকে উঠি, উঠতে উঠতেই হটস্প্রিংটা নজরে পড়ে।

আরি স্ সাবাশ -- কাজলা হেঁকে উঠেছে।

-- কী রে ? গোপালীয় ভাষায় এখন কে কথা বলছে ?

কাজলা বললে -- সে ব্যাটার কথা আবার কেন ? দ্যাখ তোদের হটস্প্রিং।

দেখি একটা বড় আয়তাকার চৌবাচ্চা, তাতে প্রচুর লোক কোমর জলে দাঁড়িয়ে চান করছে বা বাত সারাচ্ছে। জলটা ময়লায় কালো কুচকুচে। লোকগুলোর নোংরামির কথা আর নাই বললুম।

শিল্পী বলল -- মাইরি রঞ্জুদি তোমরা এই ইন্ডিয়ানরা পারোও।

-- কেন, তুই ইন্ডিয়ান নোস !

-- আমি লজ্জিত। সত্যি বলছি নেক্সট টাইম আইসল্যান্ডে জন্মাবো তবু এ দেশে আর না। সমান্যতম সিভিক সেন্স এদেশের জনগণকে শেখানো গেল না। অথচ, নাকি লার্জেস্ট ডেমোক্র্যাসি।

আমরা একটা করে লাঠি কিনি। কেননা সবাই কিনছে। ওপরে উঠতে থাকি। আর শীতবোধ হয় না। একটা অদ্ভুত আনন্দে মন ভরে যায়। হাতে লাঠি, আমরা পাহাড় চড়ছি। কেন ? না প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম মহাসঙ্গীতির স্থান দেখব। পাষণ্ড পিতৃহন্তা অজাতশত্রু হঠাৎ ভোল পাল্টে বুদ্ধভক্ত হয়ে গেছে। আয়োজন করেছে বৌদ্ধ শাস্ত্র আলোচনার জন্য। এখানেই সংকলিত হয় ত্রিপিটক। এডিটিং, ক্লাসিফাইং

অ্যানোটেশন, অ্যান্ড কালেকশন -- সূত্র পিটক, বিনয় পিটক, অভিধর্ম পিটক। কোনটা কী বলে আর বন্ধুদের বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না।

কেমন মনে হল সব দাঁড়িয়ে আছে। বিনয়ধর উপালি, মহাথের সারিপুত্ত, মোগ্ গল্লানা, দাঁড়িয়ে আছেন গৌতম বুদ্ধ, মহানন্দ, অজাতশত্রু, বিম্বিসার আরও কত কে ! বাতাসে যেন অশরীরীর নিঃশ্বাস শোনা যাচ্ছে। কথাটা ওদের বলি। কম্যান্ডার মন্তব্য করেন -- একেই বলে কল্পনা, কবি-কল্পনা।

কাজলা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড বলে উঠল -- কষ্ট কল্পনাও বলতে পার।

আমি ওদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করি। কেন না আমি এখন দেখছি ভদ্রা, ক্ষোমা, উৎপলবর্ণা, উপপলা, এবং মহাথেরী গৌতমী ও যশোধরাকে। জিজ্ঞেস করছি ভদ্রা তুমি তো ধনী পিতামাতার আদরিণী ছিলে, সন্ন্যাস নিলে কেন ? ভদ্রা উদাস কঠোর চোখে তাকিয়ে বলল -- প্রেম। প্রেম যে প্রতারণা।

বলি -- মহারাণী ক্ষেমা আপনার তো সব ছিল, রাজকুমারী, রাজরাণী, প্রেয়সী, রূপবতী সবই তো ছিলেন, কেন ?

ক্ষেমা বললেন -- প্রেম, প্রেম যে কল্পনা !

তাকাই উৎপলবর্ণার দিকে -- তুমি ?

অপরূপ নীলাঞ্জন নয়ন মেলে ভিক্ষুণী বলেন, প্রেম। পেতে দেবে না প্রতাপশালী সমাজ ...

উপপলার দীনবেশ, প্রশান্ত মুখশ্রী -- বললেন, প্রেম, বাৎসল্য, সবই যে ব্যর্থ হয়ে গেল !

গৌতমী ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

দেবী যশোধরা বিষন্ন নয়নে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে যেন রোদের মধ্যেই শীতের হাওয়ায় মিলিয়ে গেল সব।

দেখি কাজলা আমাকে ঠেলছে। কী রে সমাধি হল না কি রে ?

আমার তখনও গায়ে কাঁটা ফুটে আছে। শিল্পী বলল, তোমার এত শীত করছে রঞ্জুদি ? আমার শালটা না হয় নাও।

পাহাড় চড়লে শীতবোধ হয় না। আমারও হয়নি। কোনও কথা না বলে, খানিকটা নেমে আবার চড়ে একটা চাতালমতো জায়গায় আসি, সেখানে নাকি জরাসন্ধ আর ভীমের কুস্তি হয়েছিল। কেমন মনে হল এটা বাজে কথা। ভীম, জরাসন্ধ, অর্জুন, কৃষ্ণ কাউকেই অনুভব-টব করলুম না। নেমে গেলুম, টাঙা ধরে বাড়ি মানে ট্যুরিস্ট বাংলো ফিরতে ফিরতে ছটা। পথে একটা হোটেলে নেমে চা আর গোল মতো বিস্কুট খেয়ে নিয়েছি।

লনে দেখি একজোড়া জাপানি বসে আছে। তবু ভাল। শিল্পী সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে জাপানিদের সঙ্গে আলাপ করতে বসে গেল। ওকে সবসময়েই প্রমাণ করতে হবে ও বিশ্ব-বোন। পৃথিবীর যে কোনও দেশের লোক ওর ঘরের লোক। জাপানিদের মুখে বড় একটা ভাব ফোটে না। তবু মনে হল যেন একটু স্বস্তি বোধ করছে বিদেশে আলাপী বোন পেয়ে। আমি বাগানে বেড়াতে থাকি। কাজলা বলে একটু গড়িয়ে নিই, বুঝলি ? মালবিকাদিরও তাই মতলব। আমি আসলে কামিনীর গন্ধ পেয়েছি। কামিনীকাঞ্চনের নয়, শুধু কামিনীর অর্থাৎ ফুলের।

একটু পরে দেখি শিল্পী ডাকছে। গিয়ে নমস্কার করলুম। ছেলে দুটি একেবারে বাচ্চা। তিরিশ-এর বেশি হবে না মনে হল। শিল্পী বলল -- শী ইজ আ গ্রেট রাইটার। ডু ইউ নো ? মানে, বিশ্ব-বোন হওয়ার তাগিদে ও আমাকে গ্রেট বিশেষণ দিতেও রাজি হয়ে গেল। বাঃ ! অন্য সময় লেখা ছেড়ে দিতে বলে। চমৎকার শিল্পী বোন, চমৎকার। যখন যে তীরটি দরকার, তখন সেটি তুলে নিচ্ছ।

আমি খুব উদাস মুখ করে বলি -- য়ু মাস্ট বি ডিভোটেড বুধিস্টিস !

-- ইয়েস, ইয়েস, রাইত - সিসতার, পিলগ্রিমেজ।

-- হোয়ার আর য়ু ফ্রম ? কিয়োটো ?

কেন বললুম বলুন তো ? টোকিও, কিয়োটো, হিরোসিমা, নাগাসাকি ছাড়া জাপানের কোনও জায়গার নাম আমি জানি না। আর দুটো জানি হারাকিরি আর হাইকু -- কিন্তু কোনওটাই জায়গা নয়।

একটি ছেলে পরম বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল -- রাইত সিসতার, গ্রেত রাইতার। কিয়োতো ? য়ু নো ?

এমন করতে লাগল যেন রাইটার মানে জ্যোতিষী।

আর একজন বলল, অ্যাবাউতি সিক্সতি সিক্স কিলোমিতার্স ফ্রম কিয়োতো প্রপার।

-- কী করো তোমরা ?

-- আমাদের অবাক করে দিয়ে একজন বলল -- আমি ব্যবসা করি। আর এ আমার ছেলে ল' পড়ছে।

সাব্বাশ। বাবা ছেলেকে আমরা দুই বন্ধু ভেবেছিলুম। নাগুচি আর সিকিমো।

শিল্পী বলল -- বাট ডোন্ট থিংক উই আর মাদার অ্যান্ড ডটার। উই আর ফ্রেন্ডস। দুজনকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখে নিল দুজনে, তারপরে যথেষ্ট নুয়ে অভিবাদন করল।

কথাবার্তা বলে বুঝি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যে বিশ্ব শান্তিস্তূপ শৈলগিরির ওপরে জাপানিরা করেছে, সেটাতেই ওদের বেশি আগ্রহ। আমি রাজগৃহের প্রাচীনত্ব, তার সত্যিকারের দেখবার জায়গাগুলো তার পেছনের গল্প সহ কিছু কিছু বললুম। দুজনে হাঁ করে শুনতে লাগল। নানারকম প্রশ্ন করছে। বিম্বিসার কে ? অজাতশত্রুই বা কে ? পিতৃহত্যা করেছিল ? জাপান ছাড়া সর্বত্র মনার্কি ওইরকমই। জীবকের ম্যাংগো গার্ডেন ? জীবক প্রথম সার্জন, পৃথিবীর ? ব্যাস দুজনের আর জ্ঞান রইল না। জীবকের গল্প, দেবদত্তর গল্প, ক্ষেমার গল্প। বুঝি কিচ্ছুই জানে না। খালি জাপানি কীর্তিটির কথাই জানে এবং সেটাই দেখতে এসেছিল। দুজনের সনির্বন্ধ অনুরোধে আমি কিছুটা গাইডের কাজ করব স্বীকার করি।

রীতিমতো অন্ধকার হয়ে গেছে। মশা কামড়াচ্ছে। আমি আমার ব্যাগ থেকে ওডোমস বার করে দুজনকে দিই, তারপর বিদায় নিয়ে ঘরে যাই। শিল্পী কখন উঠে গেছে বুঝতেই পারিনি।

আমাদের ঘরে ঝকঝকে আলো জ্বলছে। দেখি চার মূর্তি রীতিমতো উচ্চস্বরে গল্প জুড়েছে। একটু যেন উত্তেজিত। ঢুকতেই শিল্পী বলে উঠল -- এই যে এলেন। মাদার-ডটার বলেছিলুম বলে এইসা ক্ষেপে গেল যে পুরো বুদ্ধিস্ট হিস্ট্রি ফেঁদে আমাকে ভাগিয়ে দিল।

সকলে অমনি 'রঞ্জু হায় হায়, রঞ্জু হায় হায়' করতে লাগল। বলা বাহুল্য আমার ছোটবেলাকার বন্ধু কাজলার গলা সবাইকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

আমি চুপটি করে জানলার ধারের কোণে বসে থাকি। কাজলা বলে -- দ্যাখ রঞ্জু, শিল্পীকে আমাদের মেয়ে হতে হলে এগারো বারো বছরে আমাদের ফিরতে হত, তবে ও এত প্যাংলা যে ফ্রক পরিয়ে খুকুমণিটি বলে চালিয়ে দেওয়াও যায়। ওকে যদি কেউ আমার ডটার বলে আমি তো অন্তত কিছু মনে করব না। তোর এমন কমপ্লেক্স কেন রে ?

আমি অবাক চোখে চেয়ে বললুম -- শিল্পী তো একবারও আমাকে ওর মাদার বলেনি। মাদার নয় - এটাই তো জোর গলায় বলল। মনে করতে যাব কেন ? আর শিল্পীর মতো করিৎকর্মা একটা মেয়ে থাকলে তো আমার পোয়া বারো। দু-দিন এক জিনিস খাব না, রোজই হোটেল খানা, সংসার নিরুপম, সমস্ত শিল্পী মেয়ের হাতে ছেড়ে দিয়ে লেখা নিয়ে থাকতে পারি।

ওরা আমার কথাগুলো হজম করছে। আমি ব্যাগ থেকে আমলকি নিয়ে মুখে ফেলি তারপর বলি -- আর ও ভেগে গেলই বা কেন ? হিস্ট্রি হল হিজ স্টোরি। হার স্টোরি। বিদেশি হয়ে তারা হাঁ করে শুনতে পারল আর শিল্পী একটা যথেষ্ট ম্যাচিওর, পৃথিবী ঘোরা, লেখাপড়া জানা মেয়ে হয়ে দুটো গল্প শুনতে পারল না ? নাও, সব আমলকি নাও। আমি আমলকির শিশি বাড়িয়ে দিই। দক্ষিণাপনের একটা ছোট দোকান

থেকে কেনা এই আমলকি যে খাবে সে-ই তর হয়ে যাবে। আমার ধারণা। কাজলার যেমন দিদিমাসি আমার তেমন দক্ষিণাপন।

সুমিতা বলল -- সত্যের অনেক মুখ। দুটো মুখ এক্ষুনি জানা গেল। শিল্পীর বিবরণ ও অ্যাটিচিউডের সঙ্গে রঞ্জুদির কোনও মিল নেই। শিল্পী স্যরি। আমাকে একটু অ্যানালিসিস করতেই হচ্ছে। আসলে তুই দেখলি জাপদের কাছে তোর ইমপর্ট্যান্স নিল হয়ে যাচ্ছে। এইটে তুই সইতে পারিসনি। রঞ্জুদি -- জাপরা কি যুবক ?

আমি শা-ন্ত গলায় বলি -- ফাদার অ্যান্ড সন। কিন্তু কোনও ফাদারের সাধ্য নেই বোঝে। দুজনেই যুবক।

তাহলে শিল্পী কেসটা আরও সরল হয়ে গেল -- সুমিতা গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল -- দুই যুবকের কাছে ওর এমন স্মার্ট মডার্ন নারীত্বর চেয়ে রঞ্জুদির ঢেউ-খেলানো নারীত্ব ও ইতিহাস-জ্ঞান প্রাধান্য পেয়ে যাওয়ায় ওর আঁতে লেগেছে।

আমি বলি -- কষ্ট পাসনি শিল্পী। জাপ, জার্মান, চিনা, অনেক যুবক এই যাত্রায় যাবি, পেয়ে যাবি। আমি আমার হিসট্রি সংবরণ করে নিলুম।

-- হুঁহ্ -- শক্তিশেল একেবারে -- রেগেমেগে শিল্পী জবাব দিল। রঞ্জুদি ইজ ভেরি স্মার্ট। কেমন নিজের কোলে ঝোলটুকু টেনে নিল।ব্রাভো রঞ্জুদি।

এইবারে 'শিল্পী বরাট হায় হায় শিল্পী বরাট হা হায়' রব উঠল। লিড করছেন মালবিকা-মা। আমার বন্ধু কাজল বলল -- রঞ্জু কেমন স্পোর্টিংলি নিল, আর তুই শিল্পী ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদেকেটে একেক্কার করলি ? হাতে হাত দে রঞ্জু। তুই আমার বন্ধু বলে আমি গর্বিত। আমি হাতটা এগিয়ে দিই।

(৯)

রাত ঝিনঝিন করছে। কোনও নির্জন জায়গায় গেলেই রাত এরকম ঝিঁঝিট বাজায়। অনেকক্ষণ জেগে জেগে শুনি। কী রকম একটা ভয় ভয়, রোমাঞ্চ রোমাঞ্চ। ভয়টাকে দুর্দান্ত উপভোগ করি। জানলার পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। প্রচুর ঠান্ডা আসছে। কিন্তু নাক-

ডাকানি মালবিকাদি ডবল কম্বলের তলায় নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। কালো আকাশে ঝকঝক করছে তারা। আশ্চর্য ! এখানে যখন মহাবীর কি বুদ্ধের শিষ্যরা ঘুরে বেড়াত, বিম্বিসারের সভাসদ কি প্রজারা, তখনও ওরা এমনই ঝকঝক করত। যখন শিশু জরাসন্ধকে জরা নামে রাক্ষসী সেলাই করে জুড়ে দিল, কিংবা ভীম আবার তাকে চিরে দিলেন এরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে। কে জানে কতগুলো এখন নিভে গেছে। লক্ষ বছর আগেকার তারা এখন দেখছি। ভগবান জানেন -- বিশ্বব্রহ্মান্ড জুড়ে কতটা এবং কী শাশ্বত আর কতটাই বা পরিবর্তনশীল। রাজগীরের প্রেক্ষাপটে যে নিজেকে জনৈকা মঞ্জুশ্রী বলে মনে হচ্ছিল সেটা কতটা সত্যি ? আজ যে কর্পোরেশনের ফাঁকিবাজ অফসর নিরুপমের স্ত্রী ও মহাদস্যি শান্তশীলের মা প্রাচীন কালে সে কি কোনও শ্রমণা ছিল ? কোনও গৃহস্থর মাসী কিংবা রাজকুমারীও থেকে থাকতে পারে। কিংবা কোনও বনবাসিনী ? কিংবা এও তো হতে পারে আমি কোনও পুরুষ ছিলুম। ভাবতে ভাল লাগছে না। যতই পুরুষরা চিরকাল ছড়ি ঘোরাক, আমি কোনও জন্মেও পুরুষ হতে ইচ্ছে করি না। আচ্ছা এও তো হতে পারে আমি জাপানি ছিলুম, কিংবা চীনা, কিংবা ওই জাপ যুবকরা ছিল ভারতীয়। এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন ঘুম এসে গেছে জানি না। কাল গৃধ্রকূট যাব !

গৃধ্রকূট বেয়ে উঠছি। শৈলগিরির চুড়োকে গৃধ্রকূট বলে। কষ্ট করে উঠছি। কমলালেবু রঙের শাড়ি ঝলসে ঝলসে উঠছে। আমার চার বন্ধুও আছে আশেপাশে। কেমন কাকতালীয়ভাবে আমরা সবাই কমলা রঙের শাড়ি পরেছি। ভোরবেলা। সূর্য এখনও পাহাড়ের ওপরে চড়েনি। মনোরম হাওয়া দিচ্ছে। হঠাৎ দেখি পথের পাশে একটা খোপমতো সেখানে জাপানি বাবা বসে বসে ধ্যান করছেন। আশ্চর্য হয়ে দেখি কিছু পরেই জাপানি ছেলে একটা পাত্রে করে কী যেন বয়ে আনল নীচ থেকে, বাবার সামনে রেখে কী যেন বলল। দুজনেই কমলা রঙের আলখাল্লা মতো পোশাক পরেছে। আশ্চর্য তীর্থযাত্রী তো ! কে যেন কোথা থেকে বলল -- এগিয়ে যাও, সামনে এগিয়ে যাও। সুতরাং এগিয়ে যাই। তারপরে দেখি পথরোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক বিরাট অথচ আশ্চর্য সুন্দর পুরুষ। পরনে কমলা রঙের আলখাল্লা, হাতে লাঠি, বললেন -- ত্রি-রাত্রি ভেবে দ্যাখো বৎসে তবে ত্রিরত্ন পাবে।

-দেখেছি প্রভু।

-- তবে প্রস্তুত হও। এই নাও ক্ষুর। চুলগুলি কেটে ফেল।

-- ওরে বাবা -- দেখি শিল্পী এক লাফ দিল ; পেছনে পেছনে নিজের কোঁকড়া চুল ঘোমটায় ঢেকে লাফ দিল কাজলা।

পুরুষের মুখে হাসি। মালবিকাদি বলল -- কেটেছি প্রভু।

আমি বলি -- প্রভু ক্ষমা করুন, আমি সামান্য মেয়ে, উপাসিকা হয়েই থাকতে চাই। ভিক্ষুণী হওয়ার মতো ভাগ্য করে কি জন্মেছি ?

হাসিতে কৌতুকের ছোঁওয়া। তিনি বললেন -- জন্ম জন্ম নারীজন্ম, প্রতারণা, প্রেমবিরহযাতনা, সংসার কষ্ট, অন্যায় সইবার কষ্ট, সন্তান ধারণের কষ্ট, প্রিয়জনের মৃত্যুর কষ্ট ... সব সইবে ?

সসম্ভ্রমে বলি -- জীবনের নেগেটিভ দিকগুলিকে বড় করে দেখার কী অসামান্য ক্ষমতা আপনার প্রভু ! তবু বলি -- এতই যদি দিতে চান তবে নির্বাণ না দিয়ে অনির্বাণ দিন না কেন ? পজিটিভ দিকগুলিকে একত্র করে এই পাত্রে রাখুন, অনির্বাণ শিখা দিয়ে জ্বালিয়ে দিন -- নিয়ে ধন্য হই। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দাময় লভির মুক্তির স্বাদ।'

পুরুষ আস্তে আস্তে ভোরের মৃদু আলো-হাওয়ায় মিশে গেলেন। মালবিকাদি বলল -- চুল কাটতে পারি, কিন্তু ভিক্ষাপাত্র ? নৈব নৈব চ। এ যাত্রা বেঁচে গেলুম। ভাগ্যে লেখিকা সঙ্গে ছিল।

ছাঁৎ করে ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখলুম সারা শরীর কন্টকিত হয়ে রয়েছে। শীতে নয়, রোমাঞ্চে। কবি-কল্পনায় হোক, কষ্ট-কল্পনায় হোক, স্বপ্নপ্রয়াণে হোক স্বয়ং বুদ্ধ তথাগতকে দেখেছি। যতক্ষণ না দরজায় টোকা পড়ে অভিভূত, বিহ্বল, বিবশ হয়ে শুয়ে থাকি, চোখ বুজে বারবার মুখটি ভাববার চেষ্টা করি। তারপর যখন দরজায় টোকা, দরজা খোলা এবং চা নিয়ে কাজলা শিল্পীর প্রবেশ সত্যিই হল -- কতক্ষণ ঘুমোবে এই মালবিকাদি, ইয়ার্কি পেয়েছ, না ? এই রঞ্জু মটকা মেরে রয়েছিস মনে

হচ্ছে, কল কল, কলর কলর। হঠাৎ দেখি স্বপ্নের মুখটি স্বপ্নেই রয়ে গেছে। কিছুতেই আর তার খুঁটিনাটি মনে করতে পারছি না।

বললে বিশ্বাস করবেন না পাঁচজনে যখন সেজেগুজে বেরোলুম দেখি শিল্পী আর সুমিতা গেরুয়া রঙের খাদির সালোয়ার কুর্তা, কাজলা কমলা রঙের সিল্ক টাঙাইল, মালবিকাদি তার ট্রেন যাত্রার সেই কমলা সিল্ক পরে প্রস্তুত। আমি তো একটি মাত্রই সালোয়ার কামিজ এনেছি। তাও অনুরূপ কমলা রঙেরই। পাহাড় চড়তে সুবিধে হবে বলে সেটা পরেছি। হতে পারে কাকতালীয়। কিন্তু আমি দেখলুম আমি কথা বলতে পারছি না।

গৃধ্রকূটের বিশ্বশান্তিস্তূপে পায়দল যেতে হলে অবশ্য আমাদের পা-গুলি তীর্থেই রেখে আসতে হত। রোপওয়ে রয়েছে। খুবই বিপজ্জনক। চেয়ার রোপওয়ে। একজন একজন করে চেয়ারে দুলতে দুলতে পৌঁছই আর একটা করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি।

বিশ্বশান্তিস্তূপ অপূর্ব। আশ্চর্য পাহাড়ের ওপর থেকে ভাঙা কারাগারের দৃশ্য, সোন-ভান্ডার, অজাতশত্রুর দুর্গ। সব যেন ছবির মতো বিছিয়ে রয়েছে নিচে। তবু এই সব ধ্বংসস্তূপ, এই সব দৃশ্য কিছুই স্বপ্নটাকে হার মানাতে পারল না। সেই বিবশ ভাব রইল বেণুবন দেখবার সময়ে, ট্যুরিস্ট বাংলোকে বাই বাই জানিয়ে গয়া-যাত্রা এবং গয়া স্টেশনে আট ঘন্টা ট্রেন লেট থাকায় রাত্তিরের ঠান্ডায় জমে গিয়ে ঠকঠক ঠকঠকানির মধ্যেও।

সবাই সুমিতার মুণ্ডপাত করছিল।

আমি বললুম -- ওর কী দোষ ! ও কি ট্রেন লেট করিয়েছে ?

মালবিকাদি বলল -- হ্যাঁ, শ্শান্তশীলের মাম্মাশীলা। কে ওক্কে বলেছিল তাড়াতাড়ি হোটেল থেকে লটবহর নিয়ে বেরোতে !

সুমিতা ক্ষীণ স্বরে বলল -- আহ্হা। নিজেরা য্যেন তাড়্ড়া দাওনি ? বব্বলো রঞ্জুদি ?

কাজলা বলল -- ভাল্লুকদের কী মজা না ?

-- কেন্ন ? হঠাৎ ভাল্লুক ?

-- সহজ্জাত কবচ-কুণ্ডল সহজ্জাত কম্বল। শ্‌শীত করে না। উহুহু ... ঠকঠকঠক ...

শিল্পী বলল -- উহ্‌, এই ন্না হল্লে কাজলাদি ? উহুহুহুহু।

আমরা কিন্তু উল্লু বনে গেছি -- মালবিকাদি বলল।

সুমিতা বলল -- ছ্‌ছিঃ অসভ্য ক্কথা বল্লো না মালবিকাম্মা !

আমি নীরবে আমলকি, মিষ্টি মশলা, লেবু যোয়ান, গুজরাতি মুখসুদ্ধি সাপ্লাই দিয়ে যাই কাজলার ঝোলা থেকে।

তারপর সত্যি সত্যি যখন অনন্ত প্রতীক্ষা শেষে আমাদের হাত-পা জমিয়ে দিয়ে ট্রেন এল ! ওরে বাবা, দেখি অগণিত মানুষ ছুটছে সেদিকে। হোল গয়া কলকাতার দিকে যাবে জানা ছিল না। কুলি ঠিকই এসেছে এবং মাল নিয়ে সেই ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। ফ্যাল ফ্যাল করে সেদিকে তাকিয়ে আছি। ও মা ! হঠাৎ দেখি সেই চার ছোকরা 'দিদি ! দিদি !' করে ছুটে আসছে। বলব কি তারাই টানাটানি, ধরাধরি, পাঁজাকোলা করে তুলে না দিলে আমরা আজও গয়ায় পিণ্ডি পাকিয়ে বসে আছি।

গুছিয়ে-গাছিয়ে সেই একই কুপেতে বসিয়ে ছোকরারা মুচকি হেসে বলল -- নিন। এবার সাধন-ভজন করতে করতে নিশ্চিন্তে যান। পেসাদ দিতে হবে কিন্তু। সুমিতা গোমড়া মুখে বলল -- ফিরতি যাত্রায় পেসাদ হয় না।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করল -- কী রে লেখিকা কথা বলছিস না যে বড় ? কিছু বাণী-টাণী দে। তখন মিটিমিটি হেসে বলি --

মনে কর যেন বিহার ঘুরে
আমরা লেডিজ যাচ্ছি যে যার পুরে
রাত্রি এল চন্দ্র নামে পাটে
বসেই আছি প্ল্যাটফর্মের কাঠে

মুখ শুধু মুখ যেদিক পানে চাই
কোনও খানে ট্রেনের দেখা নাই
শীতের চোটে হাড্ডি জমে ঝিঁঝিঁ
ছিছি খাচ্ছে সেথো সাইকলজি

এমন সময় হারে রেরে রেরে
ওই যে রে ট্রেন আসতেছে ডাক ছেড়ে
এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে
ভাবছি ট্রেনে উঠবো কেমন করে।
কাজলা বলে ভয় করিস না তোরা
আছে আমার ভাগ্নে জোড়া জোড়া।
সত্যি সত্যি কাজলা মাসির চ্যালা
কোঁৎকা মেরে হ্যাঁচকা দিয়ে মেলা
তুলল ট্রেনে ! কী আর বলি, বলার কী বা আছে !
ভাগ্যে কাজলা ছিলি মোদের কাছে !

সমাপ্ত

|| মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত || ই-বুক ||

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
Suman_ahm@yahoo.com